কিছু জানা কিছু অজানা

শক্তিপদ রাজগুরু

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

মুদ্রাকর :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বিভূতি বিশ্বাস-এর মনে হয় দীর্ঘ তিরিশটা বছর যেন একটা মুহূর্ত। এক নিঃশ্বাসেই যেন পার হয়ে গেছে সে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে হারানো সেই দিনগুলো।

মাটির রাস্তাটা কাটা খালের পাশ দিয়ে গেছে। রাস্তা নয়, বাঁধই।

কলকাতা মহানগরের লাখো লাখো মানুষের ব্যবহৃত জল-ময়লা ওই খাল দিয়ে বয়ে গিয়ে নীচের নদীতে ফেলা হয়েছে।

তারও ওদিকে দেখা যায় ধাপার উঁচু ময়লা পাহাড়ের ধূসর সীমারেখা। সেগুলো গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরের বাতিল জঞ্জাল, আবর্জনা ফেলে ফেলে জমতে জমতে ওগুলো এখন ছোটখাটো পাহাড়ের রূপই নিয়েছে।

একবার সে তার মনিব হারাধনবাবুর পরিবারের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করতে গেছল। হারাধনবাবু ছিলেন তার অন্নদাতা। মহাপ্রাণ ব্যক্তি।

তার নাম মনে পড়লে দু'চোখ জলে ভরে আসে বিভূতি বিশ্বাসের আজও।

তিনি না থাকলে, তার দয়া না পেলে আজ এই বিভূতি বিশ্বাস কোথায় থাকতো কে জানে।

সেই হারাধনবাবুই সেবার বিভূতিকে তীর্থে নিয়ে যান হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বৃন্দাবন, কাশী এই সব জায়গায়।

হরিদ্বারে দেখেছিল পাহাড়—আর পাহাড়। তার মধ্য দিয়ে গঙ্গা বয়ে আসছে। পতিত পাবনী গঙ্গা।

ভক্তি ভরে ডুব দেয় বিভূতি।

দারুণ স্রোত যেন ছিটকে টেনে নিয়ে যাবে। শেকল ধরে তবে ডুব দিতে হয়।

নিজেকে শুদ্ধ করতে গেলে এমন এক বিপদের ঝুঁকি নিতেই হয়।

হারাধনবাবু বলেন—কি রে বিভূতি! শালা কেমন ঠ্যালা ছ্যাখ। হারাধনবাবুর কথাবার্তাগুলো অমনই বলেন তিনি।

—বুঝলি বিভূতি, এই মা গঙ্গাকে দেখছিস, ওই দূর হিমালয় পাহাড় থেকে এই পাহাড়চিরে বয়ে চলেছে। নীচের সারা দেশের মানুষকে উদ্ধার করতে সারা দেশে ফল-ফসল ফলাতে। আর আমাদের ময়লা খাল দেখেছিস গাঁয়ের? বিভূতি মা গঙ্গাকে প্রণাম করে বলে—

—আপনার য্যামন কতা! কোতায় মা গঙ্গা আর কোতায় পচা খাল! আর ওই আবর্জনা ফেলা—বিষ গন্ধ-ভরা ধাপার পাহাড়! এক হলো?

হারাধনব্যবু বলেন—শালার দেখি খুব ভক্তি!

হ্যারে—ওই পচাখাল না থাকলে এত মাছের ভেড়ি হতো? বিনা সারে মণ মণ মাছ উঠতো? তোর আমার এই ফুটানি চলতো! বল!

বিভূতি চুপ করে থাকে। পরে বলে—তা অবশ্যি সত্যি!

—তবে! ওই পচাখালও আর এক মা গঙ্গা আমাদের কাছে।

বিভূতি ভয়ে ভয়ে খেয়ালী মনিবের দিকে চাইল।

শুধোয় সে।

—তাই বলে ওখানেও ডুব দিতে হবে নাকি গো!

বিভূতি সেই কল্পনা করতে শিউরে ওঠে।

পূতিগন্ধময় বড় খালটায় জল এর রং কালো—পচা পাঁক থিক্ থিক্ করে। আর পাইপে সেই জল পাম্প করে তুলে বিশাল ভেড়িতে ছাড়া হয়। তাতে যা দুর্গন্ধ ওঠে ভাবতে গা গুলোয়।

কে জানে মালিক এবার তাকে সেই খালেই না চুবোয় ফিরে গিয়ে।

হারাধনবাবু হাসেন।

—শালা মহা শেয়ানা। অমনি ভয় পেয়ে গেলি!

—তা নয় রে। বলছিলাম দেনাপাওনার কথা। ওই খালও অনেক দেয় রে।

বিভূতি তা জানে!

দূরে দেখা যায় ওই ময়লা পাহাড়ের এলাকার নীচে বিস্তীর্ণ জমিতে সবুজের নিশানা।

লোকে বলে ধাপার মাঠ।

ওখানে ওই পচা মাটিতে লকলকিয়ে ওঠে সবুজ শাক-শব্জী।

ফুলকপি—বাঁধাকপি—বেগুন—পালং শাক-টম্যাটো কি না হয়!

ওই বিস্তীর্ণ এলাকার মাটিতে যেন সোনা ফলে। ওই শাকশব্জী-আনাজপত্র কলকাতার লাখলাখ মানুষের পেট ভরায়।

তারপর শুরু হয়েছে নীচু জমিতে ভেড়ি এলাকা।

বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে গড়ে উঠেছে ভেড়ি। তাতে অফুরাণ মাছ।

রূপালী ফসল আর তার থেকেই হারাধনবাবু, নস্করবাবু, সরকার-বাবুদের টাকার পাহাড় জমে ওঠে।

বিভূতি বিশ্বাস এর মত কয়েক হাজার চুনাপুটি ওই মাছ নাড়াচাড়া করে সারা বছর অন্ন পায়।

কিন্তু দিন বদলায়, সময় চলে যায়, মানুষ চলে যায়, আসে নতুন মানুষ।

তারা নিজেদের মত করে সবকিছুকে গড়তে চায়। তাই নিয়েই বাঁধে সংঘাত। আসে লোভ-লালসা। মানুষের জীবনের ধারাটাই বদলে যায়।

বিভূতি বিশ্বাসও সেটা দেখেছে তার এই দীর্ঘ জীবনে।

এখন বাঁধের উপরের সেই কাঁচা মাটিতে সুরকি ফেলা ভাঙ্গা-চোরা নির্জন পথটা আর নেই।

সেখানে গড়ে উঠেছে পিচের রাস্তা।

সোজা কলকাতা থেকে ওই পিচ রোড এখন মিনাখাঁ মালস্বত হয়ে একদিকে সন্দেশখালি, অন্যদিকে সুন্দরবনের লাগোয়া বাসন্তিতে চলে গেছে।

ওই পথ দিয়ে এখন বাস, সরকারী বাস, টাক্সি, অটোও যায়। রিক্সা চলে অনবরত।

আর তাই রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে ছোটখাটো গঞ্জ, বাজার, দোকান সবকিছু।

আবাদ থেকে ট্রাক ভর্তি কাঠ, খড়-ধানও যায় শহরে।

সেই ফাঁকা জায়গাগুলো এখন কর্মব্যস্ত গঞ্জে, লোকালয়ে পরিণত হয়েছে।

এসেছে বহু নতুন মানুষ।

বিভূতি বিশ্বাস তাদের চেনে না।

কিন্তু বিভূতি বিশ্বাসকে এখনই এই অঞ্চলের অনেকেই চেনে। নামও জানে।

কারণ সে আজ আর সেই হারাধনবাবুর দু' নম্বর ভেড়ির সামান্য সরকার নয় যে তার নাম ভিড়ে হারিয়ে যাবে।

দীর্ঘ এই তিরিশ বছরে এই এলাকার রূপ যেমন আগাপাশতলা বদলে গেছে তেমনি এই তিরিশটা বছর বিভূতি বিশ্বাসকেও বদলে দিয়েছে।

—নমস্কার বিশ্বাস মশায়!

বিভূতি বিশ্বাস চাইল কার ডাকে।

চেনা চেনা মনে হয়। তবু অন্য ভাবনায় ডুবে ছিল বিভূতি। তাই ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

ক্রমশঃ মনে পড়ে।

—গোবিন্দ না! এক নম্বরেরর খাতা সরকার।

বয়স্ক লোকটা এবার বলে—আজ্ঞে। কেমন আছেন!

বিভূতি একটু অবাক হয়। ওর মুখে আপনি আজ্ঞে শুনে। পরে খেয়াল হয় বিভূতি বিশ্বাস এখন সরকার নয়। এখন সে নিজে ভেড়ির মালিক।

এই অঞ্চলে কয়েকটা বিশাল জলকর তার।

গোবিন্দ বলে—এসেছিলাম গঞ্জে, দেখলাম রয়েছেন এখানে। তাই এলাম! চলি—

গোবিন্দ চলে যায়।

ওই গোবিন্দকেই অতীতে বিভূতি যমের মত ভয় করতো। ওই ছিল তার চাকরীতে উপরওয়ালা!

ভেড়ির কাছারি ঘরের সেরেস্তায় বসতো গোবিন্দ সরকার। সামনে হাত ভর্তি খাতাপত্র।

তখন এখানে রূপ ছিল আলাদা।

পরিবেশও ছিল অন্যরকম। আজকের বিভূতি বিশ্বাসের চোখ থেকে সেটা মুছে যায় নি এখনও। এ তার কৈশোর যৌবনের স্মৃতিই।

দুদিকে জলা, পতিত জলা নয়। বিস্তৃত জলাভূমিতে এখানে সোনা ফসল ফলে। যত্ন করে এই জলাভূমিতে মাছের চাষ করা হয়। বিস্তীর্ণ জলার বাঁধের এখানে ওখানে দেখা যায় টং বাঁধা, সেখানে বসে রাতের অন্ধকারে পাহারা দেয় ওরা। না হলে চোরের দল মাছ ধরে নিয়ে যাবে চুরি করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই মেছো ভেড়ি।

ছোট বড় নানা আকারের ভেড়ি এই এলাকার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লাখ লাখ টাকার মাছ বিক্রী হয় এসব জলা থেকে।

জলের অভাব নেই।

দূরে মহানগর কলকাতা।

বিশাল শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যবহারের পর সেই বাতিল জলস্রোত, শহরের ময়লা দুটো বিভিন্ন গভীর খাল দিয়ে বের করে কলকাতা থেকে কুড়ি, পঁচিশ মাইল দূরে হাড়োয়া নদীতে ফেলা হয়।

ওই বাতিল জলস্রোতকে খাল থেকে স্লুইশ বসিয়ে খালের দু'পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে মাছের ভেড়ি, জলের যোগান থাকে বারোমাস।

ফলে ইচ্ছে মত জল রাখা যায় ভেড়িতে। আর শহরের বাতিল ময়লা

জলটাই মাছের উৎকৃষ্ট খাদ্য। ফলে মাছও হু হু করে বেড়ে ওঠে। জলের যোগানও ঠিক থাকে।

তাই শহরের এই দিকে এক বিরাট কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে, লক্ষ লক্ষ কেন কোটি টাকার লেন দেন ঘটে এই এলাকায় মাছের জন্যই।

বিভূতি বিশ্বাস চলেছে ওই ভেড়ির পথ ধরে, ছাতাটায় তালি মারা, হাতে লাঠি। ইদানীং লাঠি নিতে হয়। বয়স হয়েছে। চলা ফেরা করতে কষ্ট হয়। এখন বয়স হয়েছে।

কিন্তু অতীতে বিভূতি বিশ্বাস এর শরীরটা ছিল লোহা দিয়ে গড়া। তিরিশ বছর আগের বিভূতি ছিল অন্যমানুষ।

তখন এই বড় বড় ভেড়ির মালিক ছিল খেয়াদহের নস্করবাবুরা, আর শহরের সরকার, দত্তবাবুরা! কিছুদিন হারাধনবাবুর।

সেদিন ছিল শান্তির দিন।

বিভূতি বিশ্বাসের চোখের উপর সেই সব দিনের ছবি ভেসে ওঠে! বহু স্মৃতির মালার মত।

বিভূতি বিশ্বাস-এর বাড়ি ছিল লাগোয়া বামুন ঘাটার ভিতরে। খুবই গরীব—হতদরিদ্র অবস্থা। মাটির একটা ঘর কোনমতে টিকে ছিল। বাবা আগেই গত হয়েছে। সংসারে মা-ই সম্বল। বয়স হয়েছে মায়ের। আর খাটতেও পারে না। বসন্ত স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে বহু কষ্টে।

পড়াশোনায় ভালোই ছিল। মা আশা করেছিল বসন্ত স্কুলে পাশ করবে। তাকে আবার পড়াবে।

কিন্তু স্বামী মারা যেতে সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় নি।

বিভূতি এখন সাবালক।

বাজারে এর তার দোকানে কাজ করে দু' চার দিন, সে কাজও চলে যায়।

মা বলে—ছাখ, আবার কিছু একটা জুটে যাবে।

সান্ত্বনা দেয় তাকে কামিনীও।

তাদের পাশেই ওদের বাড়ি। আর অবস্থা কামিনীদেরও তেমনি। অভাবের সংসার।

ওর বাপ কোন মাছের আড়তে কাজ করে।

কিন্তু কামিনী এত অভাবের মধ্যে থেকেও যেন কি আনন্দে ভরপুর। চেহারায় একটা নিটোল সবুজ ভাব। আর কাজে কম্মেও পটু।

কামিনীই বিভূতির মায়ের কাজকর্ম করে দেয়।

বিভূতির মা বলে—লক্ষ্মী মেয়ে। ও যার ঘরে যাবে তার সংসার উথলে উঠবে রে।

বিভূতি আড়ালে বলে কামিনীকে।

—মায়ের যত বাজে কথা। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী না ছাই। কামিনী এত কাজের ফাঁকেও সময় করে বৈকালে মাঝে মাঝে বের হয়ে আসে গ্রামের বাইরে।

এদিকটা একেবারে ফাঁকা।

দূরে দূরে ভেড়ির জল চক চক করে। পুরোনো অশ্বত্থ গাছে রাজ্যের বক—অন্য পাখীদের বাসা।

বিভূতির ভালো লাগে এমনি করে একান্তে কামিনীকে কাছে পেতে।

বিভূতির ওই কথাই কামিনী ফুঁসে ওঠে।

—বেশ! বেশ! আমিই অলক্ষ্মী। তাহলে লক্ষ্মী কোথাও পাও তো জুটিয়ে নাও!

হাসে বিভূতি।

—দিন এলে ঠিকই জুটিয়ে নেব।

—তাই নিও!

কামিনী মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে।

রাগলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। দুটি ভ্রু পাখীর ডানার মত কেঁপে কেঁপে ওঠে। ডাগর কালো চোখের চাহনিও টলমল করে।

বিভূতি বলে—রেগে গেলে!

—না—না! রাগব কেন!

কামিনী জানায় রাগতভাবেই।

…সেদিন হঠাৎ বিভূতির যেন ভাগ্যের পাশাটা উলটে পড়ে।

ওদিকে বসন্তপুরে পাশাপাশি তিনটে ভেড়িই হারাধন নস্কর মশায়ের। কি কাজে চলেছেন নস্কর মশাই সেখানে।

মাটির বাঁধ যত।

বৃষ্টির জলে তাও পিছল হয়ে উঠেছে।

ওদিকে বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে হারাধনবাবু আসছেন পায়ে হেঁটে।

হঠাৎ পা পিছলেই পড়েছেন—আর পড়েছেন বেশ জোরেই। রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েছেন ধানমাঠে। আর পা-টা জোর মুচকে গেছে।

উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই।

বিভূতি যাচ্ছিল ওই পথে। ও চেনে না হারাধনবাবুকে। তবে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে ওই ভাবে পড়তে দেখে সে ছুটে আসে।

নিজেই ধরে তোলে হারাধনবাবুকে।

যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি।

হারাধনবাবু বললেন—বড় রাস্তায় আমার গাড়ি আছে। ওখানেই খবর দেবে একটু।

বিভূতি ওকে বসিয়ে রেখে ছুটে যায় দূরে বড় রাস্তায়। সেখান থেকে লোকজন নিয়ে আসে।

একটা সাইকেল ভ্যানকে বেশী টাকা দেবে বলে কোন মতে আনে।

ওর কাজের ব্যবস্থা দেখে খুশি হন হারাধনবাবু।

ছেলেটা বেশ ভদ্র হুঁশিয়ার।

ওই সাইকেল ভ্যানে তুলে কোন রকমে গাড়িতে নিয়ে আসে বিভূতি বড় রাস্তায়।

হারাধনবাবু ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছেন। তার ওদিকের ভেড়িতেও খবরটা হাওয়ায় পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে ম্যানেজারও ছুটে আসে।

হারাধনবাবু বলেন তাকে—কেমন ম্যানেজার হে তুমি—শালা ওইটুকু

রাস্তা নিজের খরচে ঠিক রাখতে পারো না। এই ছেলেটা না থাকলে পড়েই থাকতাম ধানমাঠের হাঁটুভোর জলে কাদায়।

ম্যানেজার মাথা চুলকে বলে—এবার ঠিক হয়ে যাবে।

হারাধনবাবু বিভূতিকে কাছে ডেকে একটা দশ টাকার নোট দিতে যান। তখন অবশ্য দশ টাকার দাম অনেক।

বিভূতি ততক্ষণে ওই ব্যক্তিটির পরিচয় জেনে গেছে।

বলে বিভূতি—টাকা নয়, একটা কাজ দেবেন বাবু। বড় ভালো হয়।

হারাধনবাবু বলেন—

—ওহে ম্যানেজার, এ শালা তো মহা শেয়ানা। বসতে পেলে শুতে চায়। টাকা নয়—কাজ চায়। শালা গুড় খাবে না—আখগাছটা চায় হে।

ম্যানেজার বলে বিভূতিকে।

—ওই নিয়ে যাও তো! কাজ! কাজ কোথায়!

বিভূতি হতাশ হয়।

চলেই যাচ্ছে। টাকাও নেবে না সে। বলে—উপকার করে দাম কেন নেব। ঠিক আছে।

চলে যাচ্ছে সে!

হারাধনবাবুর ডাকে চাইল।

—শোনো ছোকরা!

বিভূতি কাছে যেতে হারাধনবাবু ওকে আপাদমস্তক জরিপ করে নেন তার চোখ দিয়ে। বলেন—ওহে ম্যানেজার, শালা কাজের ছেলেই। হুঁশিয়ার!

দাও ওকে কোনো কাজে জুড়ে। তোমার ভেড়িগুলোয় তো কাজের লোকের দরকার।

ম্যানেজার কর্তার মুখের উপর আর কিছু প্রতিবাদ করতে পারে না।

ম্যানেজার বলে—কাল সকালেই 'এসো'!

হারাধনবাবু বলে—তাই যাও। আর ম্যানেজার, রাস্তা ঠিক করতে। সামনের রবিবারই ভেড়িতে আসবো।

বিভূতির চাকরী হয়ে যায় বসন্তপুরের ভেড়িতে। গাঁ থেকে একটু দূরে।

আর পুরোটাই হাঁটা পথ। ভেড়ির বাঁধ—আল-এর পথ। মধ্যে দু'একটা খালও পড়ে।

নড়বড়ে বাঁশের শাঁকো তার উপর দিয়ে কোন মতে সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়। থাকতে হবে ভেড়িতেই।

তবু চাকরীটা পেতে খুশী হয় বিভূতির মা।

বলে সে—মন দিয়ে কাজ করিস বাবা। দেখবি ওই চাকরী থেকেই তোর সব হবে।

আর আড়ালে কামিনী বলে।

—চাকরী পেয়ে আমাকে ভুলে যাবে না তো!

হাসে বিভূতি।

—পাগলী কোথাকার! তোকে কি ভোলা যায় রে।

—ইস্!

কামিনী যেন বিশ্বাসই করতে পারেন। বলে সে, দেখা যাবে।

বিভূতি সেদিন নিজের সুটকেশ আর সতরঞ্চি জড়ানো সামান্য বিছানা নিয়ে এসে হারাধনবাবুর বসন্তপুর ভেড়ির কাছারিতে হাজির হলো।

চারিদিকে ধূ ধূ ফাঁকা—জল আর জল। জলের ধারে দু'একটা করে উঁচু টংমত করা। ওগুলোয় বসে রাত ভোর পাহারা দেয় এরা।

ভেড়িতে প্রচুর মাছ, ওমনি কড়া পাহারা না থাকলে রাতের অন্ধকারে মাছ চোরের দল জাল মেরে সব মাছ তুলে নিয়ে যাবে।

তাই বিভিন্ন জায়গায় অমনি টং তৈরী করে সেখান থেকে পাঁচসেলের টর্চ মেরে তারা পাহারা দেয়। ভেড়ির এদিকে বেশ কিছুটা জায়গা।

সেখানে কিছু গাছ-গাছালি—আম, নারকেল গাছ মাথা তুলেছে। সরস মাটিতে নারকেলও হয় প্রচুর। কলাগাছও আছে।

এদিকে বড় দোতলা বাড়ি—ওপাশে লম্বা টানা ব্যারাক মত, কিছু চালাঘর। রসুই খানাও আছে। এখানেই ম্যানেজারবাবুকে দেখে বিভূতি।

নমস্কার করতে বলে ম্যানেজার।

—এসে গেছ! ওহে গোবিন্দ। ছেলেটিকে তোমার ওখানেই কাজ-কর্ম তামিল দাও। কি নাম তোমার!

বিভূতি নামটা বলতে গোবিন্দ সরকার বলে—

—এ পারবে!

বিভূতিই বলে—ঠিক পারবো সরকার মশাই!

গোবিন্দ বলে—বাবু, বাবু শরীর তো!

কিন্তু বিভূতিকে সব পারতে হবে।

এখানের কাজ শুরু হয় শেষ রাত্রি থেকেই, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত—এখানে সবই সমান।

সন্ধ্যার পরই এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

বিজলি বাতির ব্যাপার এখানে নেই।

স্তব্ধতা নামে চারিদিকে।

ভেড়ির এদিকে ওদিকের গাছে দু'চারটে রাতজাগা পাখীর ডাক শোনা যায়। আবার সব শুনলাম।

তারার আলোর রোশনী জ্বলে আকাশে, জলাভূমিতে তারই আভা। রসুইখানার বারান্দায় সবাই পাত পেড়ে বসে পড়ে! মোটা লাল চালের ভাত, কচু-কুমড়ো-এটা-সেটার ঘ্যাঁট আর ভেড়ির মাছের ট্যাসটেসে ঝোল। ডাল মেলে কোন কোনদিন।

ওই খেয়ে চলে পাহারাদারদের দল চলে যায় যে যার টং-এ।

বাকীরা বিছানা নেয় এখানে।

আর মধ্যরাতের পরেই জেগে ওঠে।

সব নৌকাও তৈরী। ছায়ামূর্তির মত মানুষগুলো জাল নিয়ে উঠে পড়ে। বিস্তীর্ণ ভেড়িতে তারা ছড়িয়ে পড়ে হিসাব মত।

তারপর জাল ফেলা শুরু হয়।

শেষরাতেই মাছ ধরতে নামে ওরা।

কিছু থাকে নৌকায়, কিছু নামে ভেড়ির জলে।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

কলরব কোলাহল ওঠে চারিদিকে। বড় নৌকার ঘোলে বদ্ধ জালে মাছ রাখা হয়।

রূপোলী মাছ।

ওরা সেই মাছ-এর স্তূপ এনে হাজির করে কাছারির সামনে কাঁটায়।

গোবিন্দ সরকার এর সঙ্গে বিভূতিকেও আসতে হয়। ওরা খাতা-কলম নিয়ে বসে। আর পাল্লায় ঢাউস বিশ কেজি বাটখারাগুলো চাপিয়ে ঝুড়িবন্দী মাছ-এর ওজন হয়।

গোবিন্দ সরকার কাঁটার দিকে চেয়ে চেল্লায়।

—ঠিক করে ওজন কর! এত ঢলতা কেন বাপ্!

ওজন হাকে। আর বিভূতিকে লিখতে হয় সেইগুলো খাতায়।

তারপর সেই মাছের পশরা নিতে আসে ওই রাতেই বেশকিছু মহাজন তার লোকজন নিয়ে।

দরাদরি—হাঁকা-হাঁকি সব কিছুই চলে।

তারপর সূর্য ওঠে।

তখন সব কোনদিকে মিলিয়ে যায়।

এত মাছ সব চলে গেছে বাজারে। লোকজনও আর নেই। মাছ ধরার লোকেরাও অনেকে চলে গেছে মাছ নিয়ে বাজারে।

কাছারির প্রাঙ্গণে তখন সূর্যের আলো নামে। শান্তি নামে। গোবিন্দ সরকার তখন চায়ের কাপ নিয়ে বসে। বিভূতি হিসাবে যোগ দিচ্ছে।

গোবিন্দ বলে—এখন চা খাও হে বিভূতি। উঃ—রাতের ঝড় এখন থেমেছে। একটু আয়েস করে চা খাও। ওসব হবে পরে।

এর পর ক্যাসের হিসাব-নিকাশ করে গোবিন্দ যাবে বৈষ্ণবঘাটের ওদিকে নস্কর মশাই-এর বড় কাছারিতে। সেখানে আরও সব ভেড়ির হিসাব এসে সকালে জড়ো হয়।

হারাধনবাবুও আসেন সেই বড় কাছারিতে।

গোবিন্দ সরকার-এর বয়স হয়েছে।

চোখেও কম দেখে রাতে। ছানি পড়েছে। আর অন্যরা বলে আড়ালে!

—ও শালা চিল গো। নস্কর মশাই-এর ভেড়ির মাছ ওই গবা সরকারের প্যাটেই ঢেক গেছে। এখনও নখ দাঁত নাই—তবু ঘা সাঁটাব্! বাপ্‌রে!

বিভূতি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারতো না কি করে কাঁচা মাছ খায় গবু সরকার।

ক্রমশঃ বুঝেছে।

ওই কাঁটাতেই আসল মারটা হয়।

বেশকিছু হাতের ব্যাপারী আসে—আর মাছ তাদেরই বেশী দেবে গবু সরকার। সেখানে ওই বিশ কেজি কাঁটার এক বাটকায় পাঁচ কেজি মাল বেড়ে যায়।

এমনি করে পাঁচ-সাতজনকে দিয়ে মণখানেক মাছ ঠিকই সরিয়ে দেয়।

আর সেই দামটাই পরে ওরাই তাদের কমিশন কেটে গবু সরকারকে পৌঁছে দেয় ঠিকমত। অর্থাৎ দৈনিক গবু সরকার দেড়শো টাকা, দুশো টাকা গায়েব করে। এই করে আসছে সে বহুদিন ধরেই।

বিভূতি ব্যাপারটা দেখে বলে—

—এত মাল কম হয় রোজ!

গবু সরকার ধমকে ওঠে—তুমি কি বলছো হে!

পরক্ষণেই বলে গবু সরকার কি ভেবে!

—একটু চোখ-কান বুজে থাকা ভালো হে! দুটো পয়সা রোজকার করতে এসেছো না ধম্ম করতে এসেছো!

রাখো—

গোটা পঞ্চাশ টাকাটাই দিতে যায় বিভূতিকে।

অবাক হয় বিভূতি।

—টাকা!

গবু সরকার বলে—কর্তা যা মাইনে দেয়—তাতে চলে?

চলে না। পেট-ভাতায় কাজ করি, পড়ে আছি মাগ ছেলে ছেড়ে এই জলাশয়ের। দুটো পয়সা যদি আসে নেব 'না? তুমিও নেবে!

বিভূতির মন সায় দেয় না!

এটা যে চুরি করারই সামিল তা বুঝেছে সে।

বলে বিভূতি—

—এ টাকা আমি নেব না।

—মানে!

বিভূতিকে দেখছে সে।

ভয়ও হয় গবু সরকারের। যদি ব্যাপারটা কর্তার কানে ওঠে সমূহ বিপদ হবে। এ ছোক্‌রা যেন একটু বেশী ট্যারা!

বিভূতি বলে।

—আপনিই নেন! তবে যা করছেন তা ঠিক নয়।

গবু এবার আরও ভাবনায় পড়ে।

বিভূতিই যেন তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলে।

আপনি যা করছেন—তা নিয়ে কাউকে বলবো না কিছু। তবে এটা ঠিক নয়।

গবু সরকার কিছুটা অসহায়ের মত বলে।

—এসব করতে তো চাই না। কিন্তু কি জানো—যা মাইনে পাই তাতে দিন চলে না? তাই একটু এদিক ওদিক করতে হয় ভায়া। বুঝতেই তো পারছো ছাপোষা মানুষ। তুমি অবশ্য ঘর সংসার করোনি —ভালোই আছো।

বিভূতিকে নিয়ে গবু সরকারের কোন সমস্যা আর হয় নি। বরং গবু মনে মনে খুশী হয়েছে। তাকে আর বখরা দিতে হয় না।

সবটাই একা সেই-ই খাচ্ছে।

অবশ্য বিনিময়ে গোবিন্দ সরকার তাকে মাঝে মাঝে ছুটিও দেয়। বলে—বাড়ি ঘুরে এসো ভায়া! মায়ের খবর নিয়ে এসো।

বিভূতি বলে—ছুটি!

গবু সরকার বলে—ওসবের জন্য ভেবনা। আমি তো আছি হে!

বিভূতি তাই মাঝে মাঝে বাড়ি আসতে পায়।

মাও এখন কিছুটা খুশী।

মাসকাবারে বাঁধা টাকা আসছে। খুব বেশী নয়, কারণ বিভূতি বাড়তি টাকা রোজকার করে না। কম হলেও মা তাতেই দিন চালিয়ে নেয়।

আর স্বপ্নও দেখে।

কামিনীও সেই স্বপ্ন দেখে।

সেও পথ চেয়ে থাকে বিভূতি কবে বাড়ি আসবে। কামিনীর কাছে সেই পথ চাওয়াও সাথক হয়।

বিভূতি সেদিন মায়ের কথায় খুশী হলেও সেই ভাবটা প্রকাশ করে না। করতে চায় না সে।

বলে বিভূতি—বিয়ে? কি বলছো মা?

মা প্রশ্ন করে।

—কেন?

বিভূতি শোনায়।

—এই মাইনেতে নিজেদেরই চলে না। আবার আর এক জনকে আনবো?

মা বলে—তাই বলে ঘর-সংসার করবি না। বৌ-এর পয়েও দিন বদলায় রে!

—যদি না বদলায় ?

বিভূতির কথায় ওর মা বলে।

—তবু দিন ঠিকই চলে যাবে। আর কামিনী তো লক্ষ্মী মেয়ে। ও সংসারে এলে আমি নিশ্চিন্ত হইরে। বয়স হয়েছে—একা থাকি! তাহলে মত দে বাবা।

বিভূতি অবশ্য আর বিশেষ প্রতিবাদ করে নি।

কামিনীরাও খুব গরীব।

তবু বিয়ে বলে কথা।

বিভূতি এসে গবু সরকারকেই বিয়ের কথাটা জানায় সেদিন সন্ধ্যার পর।

গবু সরকার তামাক টানছে।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকা রাত নামে জলায়। রাতের বাতাসে কাঁপছে নারকেল বন।

বিভূতি বলে।

—মা খুব ধরেছে। বিয়ে করতে হবে।

গোবিন্দ সরকারও চায় ছেলেটার সংসার হোক। তাহলে টাকার খাঁই বাড়বে। তারও সুবিধা হবে। দুজনে মিলে আরও কিছু রোজগার করা যাবে। কারণ গোবিন্দের এবার শরীর ভেঙ্গে পড়ছে।

বাঁধে, ভেড়িতে-জলায় ঘুরতে পারে না। তবু ঘুরে ফিরে রোজগার করার ফিকিরগুলো সে বিভূতিকে শিখিয়ে দিয়ে নিজে কাছারিতে বসে থাকবে।

আর রোজকার করে আনবে বিভূতি।

গবু বসে বসেই বখরা মারবে তার।

তাই গবু সরকার বলে—মা ঠিকই বলেছে। বিয়ে-থা কর বিভূতি।

বিভূতি বলে—মাইনে তো এই! তার উপর বিয়ে ?

গবু বলে—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। জানিস না—কথায় আছে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

ওসব হয়ে যাবে।

বিভূতির মনে পড়ে কামিনীর ব্যাকুল চোখের চাহনি। রাতের ডাগর তারার মত যেন সে তার মনের আকাশে তেমনি উজ্জ্বলতর হয়ে আছে। তাকে ভোলা যায় না।

তাই মতই দেয় বিভূতি। গবু সরকারই দশদিন সবেতন ছুটি আর কাছারি থেকে একশো টাকা বাড়তিও দেবার ব্যবস্থা করে দেয়।

বিভূতি বাড়ি আসে।

বিয়েতে তেমন ঘটা করার সাধ্য বর পক্ষ, কনে পক্ষ কারোই নেই। তাই কমসম করেই কোনমতে বিয়েটা হয়ে গেল।

গ্রামের কিছু লোককেও নেমতন্ন করে।

অবশ্য গবু সরকারই ভেড়ি থেকে আধমণ মাছও পাঠিয়েছিল।

কামিনী এল এ বাড়ির বৌ হয়ে।

বিভূতির মনে কি যেন এক বিচিত্র সাড়া জাগে। জীবনের সব অভাব, শূন্যতা যেন ওই মেয়েটি পূর্ণ করে দিয়েছে।

কাজে আসে বিভূতি। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে বাড়িতে। কামিনীর কথাই বার বার মনে পড়ে।

এই কদিনে অনেক ব্যাপারই ঘটে গেছে। সেদিন ম্যানেজারবাবুর নজরে পড়ে যায় গোবিন্দের ওই বিশেষ কারবারীদের বিশেষ ভাবে মাছ দেবার ব্যাপারটা।

ওর এমনি ওজন মারা—দু' নম্বরী ধান্দার খবরগুলো যেভাবে পৌঁছে যায় ম্যানেজারবাবুর কানে। বিভূতি তখন ছুটিতে বাড়িতে।

গবু সরকার বেপরোয়া হয়ে চুরি করছে, আর সেটা হাতেনাতেই ধরে ফেলে ম্যানেজারবাবু।

সেইসব ব্যাপারীদের মাছের ঝুড়ি আবার ওজন করাতে দেখা যায় পাঁচ সাত কেজি করে মাল বেশী নিয়ে যাচ্ছে চার-পাঁচ জন—যাদের সঙ্গে গোবিন্দের বখরা আছে।

গোবিন্দ সরকারও এবার প্যাঁচে পড়ে গেছে। ম্যানেজারবাবুর

পায়ে বডি থে্া করে কাকুতি মিনতি করে—আর হবে না! এবারের মত মাপ করুন। কর্তাবাবুর কানে উঠলে চাকরীই চলে যাবে।

ম্যানেজারবাবু শেষমেষ বলে—এখানের ভেড়িতে আর রাখছি না তোমায়। গাববেড়েতে ভেড়িতে যাও। কোনমতে সামাল দেব ব্যাপারটা।

সুতরাং তাতেই রাজী হয়ে গোবিন্দ সরকার বিদায় নিল।

বিভূতি ফিরতে ম্যানেজার বলে--বিভূতি, এখানের সরকারে কাজটা তোমাকেই চালাতে হবে। অবশ্য মাইনে বাড়বে পঞ্চাশ টাকা।

বিভূতি অবাক হয়।

—কেন গবুদা!

—ওকে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে।

সেই থেকেই বিভূতি একাই কাজটা চালাচ্ছে।

আরও খুশী সে। মাইনেও বেড়েছে এক ধাক্কায় পঞ্চাশ টাকা।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন।· কামিনী সত্যিই পয়া। তার আসায় থেকেই এই উন্নতি হয়েছে বিভূতির!

বিভূতির মাও বলে কথাটা। বৌমা আমার লক্ষী রে।

বিভূতি অবশ্য মন দিয়ে ভেড়ির কাজ করছে। ভোরে মাছ বিক্রী চুকিয়ে হিসাব কিতাব-ক্যাস নিয়ে বড় কাছারিতে জমা দিতে যায়।

সেদিন বড় কাছারিতে গিয়ে শোনে কর্তাবাবু তাকে ডেকেছেন।

পান চিবুতো নস্কর মশাই, তার গদিবাড়ির ঘরে বসে খাটো ধুতি আর ফতুয়া পরে হিসাবের খাতাগুলো দেখতে দেখতে বলতো।

—হ্যারে বিভূতি, তুই ব্যাটা দেখি পয়লা নম্বরের হাঁদারাম। শালা—

হারাধনবাবুর মুখে ওটা ছিল সহজ কথাই। তাবৎ লোকের সঙ্গে যেন তার ওই সম্বন্ধ।

বিভূতি কাঁচুমাঁচু করে—আজ্ঞে!

হারাধন বলে নাহ্! তুই শালা পারবি না। ওহে ম্যানেজার—

ম্যানেজার আসতে হারাধনবাবু তার তেল মালিশওয়ালাকে জোরে কাধ দাবাবার জন্য চীৎকার করে শালা সম্বোধন করে বলে—

বুঝলে ম্যানেজার, এই শালার বেতন গোটা পঁচিশেক টাকা বাড়িয়ে দাও, বুঝলে হে এ শালা চুরি করতে জানে না, ব্যাটা আবার বিয়ে করেছে। এ্যাই মনে ছেলে পুষবি কি করে রে ?

বিভূতির উপর হারাধনবাবুর বিশ্বাসে ভেজাল ছিল না। অন্য ভেড়ির সরকাররা ওই বিরাট টাকা নাড়াচাড়ার ফাঁকে বেশ কিছু টাকা সরায়। গোপনে মাছ বিক্রী করেও বেশ রোজগার করে।

বিভূতি তা করে না।

তাই তার দু'নম্বরী খাতায় যা জমা পড়ে সেটা অন্য সব ভেড়ির আয় থেকে অনেক বেশী।

বিভূতি বিশ্বাস তখন বছর খানেক হল বিয়ে করেছে। এই ভেড়ি থেকে তাদের গ্রাম বেশ দূর। বৌ সেখানেই থাকে। সামান্য অবস্থা, কয়েকটা ডোবা, আর সামান্য বিঘে দুয়েক ধান জমি, তাতে আর তেমন কিছু হয় না।

বিভূতির মনে পড়ে নোতুন বউ কামিনীর কথা।

পেটের দায়ে দূরেই পড়ে আছে বিভূতি।

বিভূতির মনে হয় হারাধনবাবুকে বলবে ওদের গ্রামের কাছে নস্কর মশাই-এর ভেড়িও আছে। যদি সেই বসন্তপুরের ভেড়িতে তাকে সরকার করে পাঠায় তবু বাড়ির খেয়ে কাজ করতে পারবে। দুটো পয়সা বাঁচবে।

কিন্তু ভয় হয় বলতে। মুনিব কি ভাববে কে জানে।

...দিন বদলাচ্ছে। —তারপব দেশ বিভাগের ছায়া পড়েছে এই দূর নির্জনের জলকরেও। মাছের দরও বাড়ছে, আর শোনা যাচ্ছে এবার জমিদারী প্রথা উঠে যাবে।

সেদিন খেয়াদহের কাঁটাতেও এ নিয়ে বেশ জোর আলোচনা হচ্ছিল।

কেশব ঘুঘু এই দিগরের মাতব্বর। এবার ভোটেও দাঁড়াবে। জলকর, মেছো ভেড়ি মালিকদের সঙ্গে তার দহরম মহরম আছে। কলকাতাও যাতায়াত করে। আর এই অঞ্চলের মালি-মাযলা, ফৌজদারী কেস এসবেরও তদ্বির করে কেশব। ঠং ঠং-এ একটা সাইকেল দাবড়ে ঘুরে বেড়ায়।

খেয়াদহের হাটতলায় বংশীর চায়ের দোকানের ভাঙ্গা বেঞ্চে বসে তার মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

—তোর মামলা দেখবি জিতিয়েই দোব। উকিলবাবুকে একটু খুশী করতে হবে। গোটা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যাবো কাল।

কেশব ঘুঘুকে ওই বিচিত্র পদবী আর তাই ওই টাউট গিরির জন্য এই এলাকার অনেকেই তাকে চেনে আর কেশবও ঠং ঠং-এ সাইকেলে কখনও পদব্রজে এগাঁ, ওগাঁ—এ হাটতলা, ও হাটতলা ঘুরে খবর সংগ্রহ করে।

কার সঙ্গে জমি নিয়ে কার বিবাদ। কার বাঁশঝাড়ে কে জোর করে বাঁশ কেটেছে, কার বাড়ির সীমানা নিয়ে কার সঙ্গে বিবাদ, কোথায় কিছু ঝগড়া ঝনঝাট হলো কিনা।

তেমন কিছু হলে সে বানের আগে খড়কুটোর মত ভেসে গিয়ে হাজির হয় আর দুপক্ষের মধ্যে সেই বিরোধের আগুন আর ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে বলে—

—কোর্টে চল। তোমার জমি তোমারই হবে খুড়ো। কাউকে বলে—মানহানির কেস কর! ঠাণ্ডা করে দে ব্যাটা ঘোষের পো-কে। আমিই সব ব্যবস্থা করছি।

আলিপুর-শিয়ালদহ মায় হাইকোর্ট অবধি কেশব ঘুঘুর যাতায়াত। উকিলরা ওর হাতের লোক। সুতরাং মামলা শুরু হলো।

কেশবের তৎপরতাও বাড়লো। শেষ মেষ উভয়পক্ষেরই বেশ কিছু গিলে কেশবই লাভবান হলো।

তাই লোকে আড়ালে ওকে বলে—বাস্তু ঘুঘু।

এহেন কেশবই খবরটা আনে।

একেবারে যাকে বলে ঘোড়ার মুখের খবর। এতদিন ধরে একটা শ্রেণীই এইসব জমি-ভেড়ির দখল কায়েম করে রেখেছিল। এখন সবকার সেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে সেইসব জমির মালিকানা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিতে চায়।

হাটতলটা ওই বিরাট পচাখালের ধারে গজিয়ে উঠেছে। এদিকের জমিদার ওইসব বিস্তীর্ণ জমি, ভেড়ি এসবের মালিক নস্কররা—সরকার মশাইরা।

কেশব বলে—এবার সরকারের এক কলমের খোঁচায় সব বিলকুল ফৌত হয়ে যাবে।

ক্রমশঃ কিছু লোকও জুটে যায়।

সকালে হাটতলা বেশ জমে ওঠে। এই এলাকার আনাজপত্র-শব্জীও আসে অনেক। পাইকাররাও এসে জমে। সেইমত আনাজপত্র পাইকেরী দরে কিনে নিয়ে যায় কলকাতার বাজারে।

ট্রাক—ছোট ট্রাকগুলোও মাল নিয়ে যাবার জন্য এসে ভিড় জমায়। আর এখানের মাছের বাজারের কাজ শুরু হয় ভোর থেকেই।

চারিদিকের ভেড়ি থেকে প্রচুর মাছ আসে এখানে। আর হারাধন-বাবুর ভাইপোও এখানে একটা আড়ত করেছে।

চারিদিকের ভেড়ির রুই কাতলা—চারা পোনা—ভেটকি—বাগদা সবই আসে। গাদাবন্দী মাছ জমা হয়। আর মহাজন তখন বাজারের চাহিদা বুঝে মাছের দর হাঁকে—সেই দামের উপর অন্য পাইকেররাও দর দেয়। এইভাবে নীলামে দর উঠে মাছ বিক্রী হয়।

এতে ভেড়ির মালিকও দাম ভালোই পায়।

আর সেই দামের উপর কাঁটামহাজনেরও কমিশন থাকে।

বিভূতি দেখছে ব্যাপারটা।

মহাজনের লগ্নী কিছুই নেই। শুধু খরচার মধ্যে থাকে তার টাট-বাট আর একটা চালা ঘর।

মাল অপরের শুধু বিচে দাও, ফাঁক থেকে মোটা কমিশন লাভ করো।

বিভূতি বিশ্বাস ভাবছে কথাটা।

সামান্য চাকরীতেই পড়ে আছে। কিছু মূলধন পেলে সেও এমনি কাঁটা বসিয়ে আড়ত করতো।

দেখছে বিভূতি এতে লাভ কতো।

হাটতলায় সেদিন এসেছে, তাদের কিছু মাল এখানে বিক্রী হয়।

কাজকর্ম চুকিয়ে হাটে ঘুরছে বিভূতি।

ওদিকের গাছতলায় কাপড়ের ব্যাপারীরা শাড়ি-গামছা রঙ্গীন জামা এইবার নিয়ে বসেছে।

একটা গোলাবী রং-এর শাড়ি তার নজরে পড়ে। দেখছে বিভূতি শাড়িটাকে।

ওই শাড়িতে কামিনীকে মানাবে চমৎকার।

নিটোল দেহ—ডাগর চোখ—হাসিভরা মুখ কামিনীর। আর হাসিটাও তেমনি মিষ্টি।

কলকলিয়ে কারণ অকারণে হাসে। কামিনী শাড়িটা পেলে খুব খুশী হবে।

বিভূতি দর করে—কত দাম গো শাড়িটার ?

দোকানদার বলে—

পনেরো টা—কা !

বিভূতি একটু চমকে ওঠে। কারণ তখনকার দিনে পনেরো টাকাটা কম নয়। অনেক টাকা। বিশেষ করে তার কাছে।

অবশ্য বিভূতি আগেকার সেই গোবিন্দ সরকারের নির্দেশিত টাকা রোজকারের পথটাকে কোন দিনই মেনে নিতে পারেনি। এখনও সে সৎ রয়ে গেছে।

মাছের ওজন, বাজার দর নিয়ে মালিকদের সঙ্গে কোনদিন কোন তঞ্চকতাও করেনি।

তাই অভাব তার ঘোচেনি। তবু মাথা উঁচু করে থাকে বিভূতি।

দোকাকানদার বলে—নেবেন ?

বিভূতির সাধ্য নেই। বলে সে—থাক !

এমন সময় ওদিকের চায়ের দোকানে গুলতানি দেখে এগিয়ে যায়। বটগাছের নীচে বাঁশের মাচা মত করা।

সামনে ঝুপড়ির চায়ের দোকানে চা তৈরী করছে দোকানদার !

এদিকে কেশব ঘুঘু হাত-পা নেড়ে তখন ভাষণ দিয়ে চলেছে। আর বিভূতিকে দেখে সে হাঁক পাড়ে।

—এই যে বিভূতি—শোনো, শোনো—

বিভূতির সময় নেই। আড়তের দামপত্র নিয়ে মালিকের কাছে যেতে হবে।

তবু কে বলে—খবরটা শুনে যাও সরকার—

বাকী কথাটা কেশবই শোনায়—

—ফুটে গেল হে—সব বাবুই এবার কাবু হবেন। এতদিনের রাজত্বি এবার ফৌত। সব জমি—ভেড়ি এখন পাবলিক্-এর হাতে আসবে।

বিভূতির কথাটা কানে যায় মাত্র।

কেশব ঘুঘু এমন অনেক ভাষণই দেয়। সবই তার ফাঁকা আওয়াজ।

তাই সরে যায় বিভূতি।

কে বলে—আহা ! বেচারা দাগা পেয়েছে গো।

অন্যজন বলে—পাবে না ? এতদিন বাবুদের সর্বস্ব লুটপাট করে লবর ছবর করতে। এবার !

বিভূতি তখন এগিয়ে চলেছে।

কেশব ভেবেছিল সুখবরটা শুনে বিভূতি সরকার কোন মন্তব্য করবে। কিন্তু সে সব কথায় কান না দিয়ে চলে যেতে দেখে একটু হতাশই হয়।

বলে সে—বুঝবে পরে।

বেলা বেড়ে ওঠে। হাটতলার ভিড় কমে এসেছে।

লোকজন-পাইকেররা মালপত্র নিয়ে চলে গেছে। হাটের দোকান-দাররাও তাদের অস্থায়ী দোকানপত্র তুলে এবার বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত।

কেশব ঘুঘু আরও দু' একটা পার্টির কাছে তাদের মামলায় নানা খরচার হিসাব পেশ করার জন্য বের হয়ে পড়ে। তাদের দু' একজনকে ধরে শোনায়।

—তোমার মামলায় ওরা খামোকা দিন নিয়ে ভোগাচ্ছে হে। এবার খাস পেশকারকে ধরেছি। আর একটা দিনও ফেলবে না। এই দিনই তোমার মামলার রায় বেরুবে।

লোকটা বলে—জিতবো তো ঘুঘুমশাই ?

—জিতবে না মানে ? কেশব গর্জে ওঠে—এ জেতা মামলা।

ব্যাটাদের জমি ছেড়ে দিতেই হবে। তবে—

ওই তবে শুনেই লোকটা ঘাবড়ে যায়।

—মানে ? হাসে ঘুঘুমশাই।

—কিছু খরচা করতে হবে। সেরা উকিল দেব—ধরো শ' তিনেক বেশী লাগবে। তবে মামলা জিতে যাবেই।

শেষ অবধি একশো টাকায় রফা করে, ঘুঘু টাকাটা নিয়ে মামলার রায় শুনিয়েই উঠলো।

এবার তার ঘরে ফেরার পালা।

আজকের মত কেশব ঘুঘু বাণিজ্য শেষ করে ভেড়ির পথ ধরে সাইকেল হাঁকিয়ে আসছে।

ওদিকেই বিভূতি বিশ্বাসদের ভেড়ির ছোট কাছারি।

গাছগাছালির ছায়া নামে।

কি ভেবে ঘুঘু মশাই এবার ওদের সুখবরটা দেবার জন্য সাইকেল থেকে নামে। তার মতলব—যদি মুফতে কিছু মাছ জোটে !

ওকে দেখে ডাকে পবন ফতেদার।

—কি গো কেশব ! হাটতলার কি সব শুনছিলাম বলাবলি করছিলে ?

কেশব উঠে আসে।

এবার মৌকা পেয়ে সেরেস্তায় বসে বলে—কি গো বিভূতি—কর্তাদের ওখানে গেছলে ?

বিভূতি বলে—হ্যাঁ !

কেশব শোনায়—তাহলে চাল দেখলে কেমন বড় কাছারির ?

হারাধনবাবু কিছু বললেন ?

বিভূতি অবাক হয়। কই না তো !

পবন ফতেদার কিঞ্চিৎ নিরাশ হয়।

—শোনলেন না কিছু ?

বিভূতি বলে—কই না তো ! সব ঠিক ঠাকই চলছে দেখলাম।

হারাধনবাবুও কিছু বললেন না।

হাসে কেশব ঘুঘু—বলবেন কেন হে ? ওরা ত এসব খবর যতদিন পারে চেপে রাখবে। গভীর জলের মাছ তো। এসব সর্বনাশের খবর জানাজানি হলে ওদেরই বিপদ হবে তো ? তাই যতদিন পারে চেপে চুপেই থাকবে।

তবে এ হচ্ছে পারার ঘা।

যতই চাপো একদিন ফুটে বের হবেই। দেখবে পবন সেদিন তোমাদের দুঃখ ঘুচবে হে। এসবের মালিক হবে তোমরাই।

এ হেন সুখবরে পবন কেন উপস্থিত অন্য কর্মীরাও খুশি হয়।

পবন হাঁক পাড়ে।

—ওরে গোপ্‌লা, ঘুঘুমশাইকে মাছ কিছু থাকলে দে।

ভেড়ির মালিকানা যেন ওইই পেয়ে গেছে।

কেশবও খুশী হয়ে মাছ নিয়ে যাবার সময় বলে—আর কিছু খবর পেলেই জানাবো হে। দেখবে আমার খবর সবই সত্যি।

দু'একদিন ফাঁক পেলেই বিভূতি গ্রামের বাড়িতে আসে। আর কবে আসবে সেই দিনের অপেক্ষায় বসে থাকে বিভূতি। মনে হয়

এবার হারাধনবাবুকে তার আর্জিটা জানাবে।

বিভূতিদের গ্রামের কাছেই হারাধনবাবুদের একটা জলকর আছে।

যদি ওই বসন্তপুরের জলকরে তাকে বদলি করেন মালিক, বিভূতির ঘরের খেয়েই কাজ হবে।

কামিনীকেও কথাটা বলেছে বিভূতি।

কামিনীও খুশি হয়।

এমনি হা-পিত্যেশ করে স্বামীর কাছ থেকে দূরে 'পড়ে থাকতে চায় না সে।

সে-ও স্বপ্ন দেখে দিনের শেষে খেটেখুটে মানুষটা ঘরে ফিরবে। কামিনী স্বামীর ফেরার পথ চেয়ে থাকবে। আর সেবা যত্ন করতে পারবে। তাকে সব সময়ই কাছে কাছে পাবে। এ তার স্বপ্ন। কিন্তু আজও কামিনীর সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয় নি। অথচ গ্রামের কত বৌকে দেখেছে তারা এদিকে কত ভাগ্যবতী।

সেদিন বিভূতি বাড়ি এসেছে।

দুপুরে ওদের ভেড়ি থেকে বের হয়ে মাঠ-খাল অনেক পথ পার হয়ে বাড়ি ঢুকেছে তখন সন্ধ্যা। কামিনী সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালছে।

এমন সময় বাড়িতে পা দেয় বিভূতি—মা।

মা ইদানীং চোখে কম দেখছে। ছানি পড়েছে। তবু গলার শব্দে আর আবছা দেখায় চিনেছে মা।

—বিভু এলি বাবা ?

বিভূতি এগিয়ে যায়। হাঁক পাড়ে

—বৌমা ! বিভু এসেছে,—চা-টা দাও বাছা।

কামিনী অবশ্য আগেই দেখেছে। বলে সে—দিচ্ছি মা !

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সেদিন কামিনী আবার সেই কথাটা পাড়ে স্বামীর কাছে।

—কি গো ! এখানে বসন্তপুরের জলকরে বদলি নেবার কথা বলেছিলে। তার কি হলো ?

বিভূতিও কল্পনা করে এখানেই বদলি নিয়ে এসেছে সে। বাড়ি থেকেই ভোরে সাইকেলে যাতায়াত করে। রাতের শুকতারা তখনও খালের জলে ঝিকিমিকি তোলে।

রাতশেষে পাখ-পাখালির ঘুম ভাঙ্গছে।

কামিনী তারপথ চেয়ে থাকে। কিন্তু এখন তা স্বপ্নই রয়ে গেছে।

তবু স্ত্রীর কথায় বলে।

—ক'দিন একটু ঝামেলা চলছে। বাবুদের তাই বলা হয় নি।

—ঝামেলা! ঝামেলা কিসের গো! শুধোয় কামিনী।

বিভূতিও শুনেছে জমিদারী চলে যাচ্ছে।

অবশ্য বাবুদের মুখে তেমন কিছু শোনেনি। ওরা সহজ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলেছেন। সবই ঠিক-ঠাকই চলছে।

কিন্তু তবু বড় কাছারিতে কেমন একটা বিচিত্র শুন-শান ভাবই দেখেছিল।

আড়ালে সদর নায়েব। গোমস্তা-সরকাররা কি যেন ফুস-ফাস করছে। বিভূতির ভালো লাগেনি।

হরি গোমস্তাকে আড়লে শুধোয় সেদিন বিভূতি।

—কি খবর গো হরিদা? এত গুজগুজ ফুসফুস হচ্ছে চারিদিকে।

দত্তদের সেরেস্তার শশী বলছিল জমিদারী জলকর এসব নাকি উঠে যাবে। কিছু শুনেছো তোমরা?

হরি গোমস্তা সাবধানী লোক।

ও জানে বিভূতির সঙ্গে খাস হারাধনবাবুর বেশ জানাশোনা। মালিকও তাকে ভালোবাসে। তাই বুঝেছে তেমন কিছু বললে সেটা কর্তাবাবুর কানে চলে যাবে।

আর বাবুদের কোপ পড়বে তারই উপর। কর্তাবাবুদের সর্বনাশের খবর নিয়ে কর্মচারীরা খুশি হয়ে আলোচনা করছে এটা জানলে বিপদই হবে।

তাই বলে হরি গোমস্তা, —কই না তো! এবার পুজোয় কি

ব্যবস্থা হবে তারই হয়ে—কথাবার্তা হচ্ছিল। আবার কি হবে!

বিভূতিকে এড়িয়ে গেল হরি গোমস্তা। কিন্তু তবু বিভূতির মনে হয়েছে একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

তাই কর্তাদের তার আর্জি জানাবার সময় সুযোগও পায়নি।

আজ স্ত্রীর কথায় বলে বিভূতি—না! শুনছি জমিদারী, জলকর এসব বাবুদের হাত থেকে চলে যাবে। একটা সীমা বেঁধে দেবে সরকার। তার বেশী জমি, জলকর কেউ রাখতে পারবে না।

সেকি গো! অবাক হয় কামিনী! এসব যেন ভাবতেই পারে না। সে শুধোয়।

—তাহলে সে সবের মালিক হবে কারা?

বিভূতিও সঠিক জানে না।

কেশব ঘুঘুও সঠিক কিছু খবর দিতে পারেনি। নানা গুজবই শুনেছে।

বলে বিভূতি—বোধহয় সরকারই হবে। তারা আবার যাদের কিছু নেই তাদের মধ্যে বিলি করবে।

কামিনী ভাবনায় পড়ে।

—তাহলে তোমার চাকরীর কি হবে?

বিভূতিও ভাবনায় পড়ে—জানিনা বৌ। এরপর অদৃষ্টে আর কি লেখা আছে। এ তবু যেমন করে হোক চলছিল কিন্তু এখন কি হবে তা জানি না।

কামিনীরও চোখে ঘুম আসে না নানা ভাবনায়। পরদিন ভোরেই বিভূতি নানা চিন্তা ভরা মন নিয়ে ফিরে আসে ভেড়িতে।

সবই ঠিক ঠাক চলছে কাজকর্ম।

ভোররাতে জালও নামছে ভেড়িতে। যথারীতি মাছ ধরা হয়! ওজনদার ওজন করে খাতায় লিখে মাল পাঠানো হচ্ছে আড়তে।

কেনাবেচাও চলে।

কিন্তু হাওয়ায় যেন কি চাপা উত্তেজনা, নানা গুজবই ছড়ায়।

ভাবনায় পড়ে বিভূতির মত ছাপোষা মানুষ। এর মধ্যে তার সংসারও বেড়েছে। একটি ছেলেও হয়েছে। তাই ভাবনাটা বাড়ে।

হারাধন নস্কর, তার অন্য শরিকান সমাজের অনেক তাবড় ব্যক্তিই খবরটা জেনেছে। আজ না হোক দু'চার মাস পরও ব্যাপারটা ঘটবে। তার পূর্বপুরুষরা অতীতে এই বাদাবনে বসতি পত্তন করেছিল।

নীচ জলাভূমি—মানুষ অসতো না এদিকে। ওরা সেই জলাজমিতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে মাছের চাষ শুরু করবে।

আর সরকারকে নামমাত্র মূল্য দিয়ে তখনকার কর্তাদের কিছু প্রণামী দিয়ে এসব জমির রেকর্ডে তাদের নাম পত্তন করেছিল।

এইসব জলকর থেকে নস্কর মশাইরা কয়েক বছর ধরে বহু টাকা কামিয়েছে।

শুধু নস্কর মশাইরাই নয়, এই অঞ্চলের বেশকিছু মানুষ এর থেকে প্রভূত টাকা কামিয়ে কলকাতা শহরে বিশাল বাড়ি জমি করেছে।

নানা ব্যবসার পত্তন করে আজ বেশ গুছিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এবার এসেছে দিনবদলের পালা। জমিদারী চলে যাচ্ছে।

এইসব জলকর এর সীমান্ত বেঁধে দিচ্ছে সরকার। আর যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে এত জলকর, জমিজায়গা রাখা যাবে না।

হারাধনবাবুর উকিলরাও অবশ্য এসব খবর আরও বেশী করে জেনেছে।

তাদের জানতে হয়েছে মক্কেলদের স্বার্থে।

তারা সরকারী অফিসে—অন্যত্র—নেতাদের কাছেও যাতায়াত করেছে।

হারাধনবাবুদের মত অনেকেই তার জন্য টাকাকড়িও খরচা করেছে।

তারাই খরচ আনে। আর তারাই পরামর্শ দেয়।

—বাবু, এর বেশী জমি, জলকর একনামে রাখা যাবে না। সব

সরকার নিয়ে নেবে। আর তার জন্য ক্ষতিপূরণ কি দেবে তাও সঠিক জানা যায় নি।

ভাবনায় পড়েন হারাধনবাবু!

শুধোন—কিছু পথ নেই হে?

উকিলবাবু বলেন—এখন থেকে নামে বেনামে বেশকিছু সম্পত্তি, জলকর সরিয়ে দেন। স্ত্রী-ছেলে আত্মীয়-স্বজনদের নামে হস্তান্তর করে দিন।

হারাধনবাবুর সম্পত্তি অনেক।

তবু সেইমত ব্যবস্থাই করতে চান তিনি।

তাই সেরা আবাদী জলকরগুলো স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের নামেই করা হোল।

কিছু জমি জায়গার ব্যবস্থাও করা হোল।

কিন্তু তারপরও রয়ে গেল বেশকিছু সম্পত্তি।

আর বাজারে-এর মধ্যে খবরও রটে গেছে যে জমিদারী আর থাকবে না।

ওসব জমি এখন কেনা নিরাপদ হবে না।

কারণ সরকার আবার কি আইন করে কেড়ে নেবে তার কোন ঠিকানাই নেই।

রেজেষ্ট্রী অফিসের মুহুরীরা—দলিল লেখকরাও খুব ব্যস্ত।

এত হস্তান্তরের দলিল একসঙ্গে এর আগে কখনও লেখা হয় নি। তারাই বলে—এরপর কি হয় দেখা যাক।

হারাধনবাবুও দেখেন এইভাবে নানা কৌশলে বেশ কিছু সম্পত্তি সরাবার পরও আরও বেশ কিছু জলকর রয়ে গেছে।

অবশ্য সেগুলো তেমন লাভজনক নয়।

তাই সেগুলো বিক্রী করার চেষ্টাও করে তার ম্যানেজার।

কিন্তু লোকজন আগেই সতর্ক হয়ে গেছে।

কোন চতুরব্যক্তি ভাবে ওসব আমাদের হাতেই এমনিতে এসে যাবে।

সুতরাং টাকা দিয়ে কেনা মানেই বোকামি। তাই খদ্দেরও তেমন কেউ জোটে না।

যদিও কেউ আসে যা দাম দেয় তার চেয়ে বিক্রী না করাই ভালো!

এমনি মুফৎপানেওলাদের মধ্যে কেশব ঘুঘুই একজন।

সে নানা খবর রাখে।

আর জানতে পারে বেশ কিছু বিষয় এখন জমিদারবাবুদের গলায় কাঁটার মত বিঁধে আছে। সেগুলোকে তারা না পারছে ফেলতে না পারছে গিলতে।

তাই কেশব ঘুঘুও স্বপ্ন দেখে এবার সারা অঞ্চলে ঘুরে টাউটাগিরি করার চেয়ে সেও ছোটখাটো জলকর মালিক হয়েই বসবে।

তাই সেদিন হাধাধনবাবুর কাছারিতে এসে হাজির হয় বেশ সেজেগুজেই।

কারণ এর মধ্যে সে দত্তবাবুদের কিছু জমিও হাতিয়েছে।

হারাধনবাবু সেদিন সেরেস্তায় বসে জমি, জলকর বিলির কাগজপত্র দেখছিলেন হঠাৎ কেশব ঘুঘুকে ঢুকতে দেখে চাইলেন।

লোকটার পরণে এখন ভালো জামা-কাপড়। চুলে টেরির বাহার বাহার এসেছে। বড়বাবুকে নমস্কার করে সটান এগিয়ে এসে তার বিনা অনুমতিতেই ফরাসে বসে পড়ে।

হারাধানবাবু ওর সাহসে কিছুটা বিস্মিতই হন।

চাইলেন মাত্র।

সেই চাহনিতে ফুটে ওঠে বিরক্ত বিস্ময়ও। তার মনে হয় জমিদারী যেতে না যেতেই একদল বাজেলোক যেন ঠেলেঠুলে তাঁদের সরিয়ে সমাজের বুকে সেই শূন্য জায়গাটা তারা দখল করতে চায়।

কেশব ঘুঘু সেই নতুন গজিয়ে ওঠা শ্রেণীর জীবদের একজন।

তবু রাগটা চেপে শুধোন হারাধনবাবু! —কি ব্যাপার হে কেশব?

কেশব বলে—আজ্ঞে একটু দরকারে এসেছিলাম।

—বলো কি দরকার?

হারাধনবাবু দেখছেন ওকে। কেশব বলে—শুনলাম কিছু জমি, জলকর বিক্রী করবেন। অবশ্য এখন বিক্রী করা ছাড়া আর করবেনই বা-কি!

হারাধনবাবু ওর ভারিক্কী চালের কথা শুনে মনে মনে জ্বলে ওঠেন।

তবুও চুপ করে শুনছেন কেশবের কথাগুলো।

কেশব বলে—আমাকেই কিছু জমি, জলকর বিক্রী করেন।

হারাধনবাবু বলেন—কত টাকা দেবে বিঘে পিছু? জলকরই দেব—ধরো শ'দুয়েক বিঘের জলকর। ওই বসন্তপুরের জলকরই দেব।

কেশব বলে,—এখন ওসব নেওয়াতো বিপদের কথা। তবু আপনি যখন বলছেন দেব হাজার দশেক টাকা, তবে দু কিস্তিতে। আর ধরুন ওর মাছ আপনি তুলতে পারবেন না। তাহলে কালই পাঁচ হাজার দেব।

জ্বলে ওঠেন হারাধনবাবু!

কেশব এর মধ্যে পকেট থেকে বিড়ি বের করে দেশলাই ঠুকে ফস্ করে বিড়িটা ধরিয়ে একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলে।

—তাহলে কালই বায়না করে যাই, এখন যা পান তাই লাভ!

হারাধন গর্জে ওঠেন—ওঠো। ওঠো—

কেশব হকচকিয়ে যায়।

—মানে! কি বলছেন?

হারাধনবাবু হাঁক পাড়েন।

—জ্ঞান সিং। রূপচাঁদ—

ওর ঘরের বাইরে ওরা মজুত থাকে।

মালিকের ডাকে তারা ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে।

হারাধনবাবু গর্জে ওঠেন।—কান ধরে এই পাজি নচ্ছার হতভাগাকে বের করে দে। এখুনি বের করে দে—

কেশবের কানেই ধরেছে তারা।

কেশব বলে—কি করলাম?

হারাধনবাবু বলেন—জমিদারী এখনও যায়নি। তুমি যে আজও পথে পথে ফ্যা ফা করে ঘোর—সেই তুমি এসে ফরাসে বসে মুখের উপর বিড়ির ধোয়া ছেড়ে টাকা দেখাও? শালা—ইস্টুপিট!

বের করে দে ওটাকে?

কেশব কিছু বলার আগেই রূপবাদের দল মালিকের হুকুম মত কেশবকে ঠেলে বের করে আনে।

কেশব ও এহেন অপমানে বাইরে এসে ফেটে পড়ে।

—দেখে নেব। এত তেজ কোথায় থাকে?

সব যেতে বসেছে। এখনও তেজ যায় নি।

অবশ্য কেশব কাছারির সীমানার বাইরে এসেই এসব লম্ফঝম্ফ করে, জানে ওই রূপবাদের দলকে।

তাহা তার মত দু-চারটে কেশব ঘুঘুকে গায়েব করে দিতে পারে।

হারাধনবাবু এবার তাই ভেবে চিন্তে একটা উপায় বের করেন।

কেশবকে তাড়িয়ে তিনি বসে আছেন কাছারিতে। বেশ মনে হয়েছে একটা দিন আসছে যেখানে ওই কেশবদের মত লোকটাই মাথায় উঠে বসবে। আর ওরাই তাদের জমি জলকর কেনার লোকদের ভয় দেখাচ্ছে—যাতে আর কেউ কিনতে না আসে। জমিদাররা বাধ্য হয়েই ওদের কাছে জলের দামে এসব বিক্রী করে দেবে।

কিন্তু হারাধনবাবু তা হতে দেবে না।

দরকার হলে তার বিশ্বস্ত লোকদের হাতেই তুলে দেবেন ওই সব।

যাতে অন্ততঃ তার কিছু লোক উপকৃত হবে।

আর সেই জন্য মনে পড়ে হারাধনবাবুর বিভূতি সরকারের কথা।

ছেলেটা সৎ, পরিশ্রমী। আর এর মধ্যে জলকর চালানোর সব কাজেই শিখেছে। বুদ্ধিও আছে। মনেহয় হারাধনবাবুর কেশব ঘুঘুকেও দেখিয়ে দেবেন যে সে ভুল জায়গায় এসেছিল। বিভূতি বিশ্বাসের কথাই মনে পড়ে হারাধনবাবুর।

বিভূতি বিশ্বাস সেদিন সকালের ধরা মাছ আড়তে বিক্রী করে,

রোজকার মত ক্যাস কড়ি হিসাবপত্র নিয়ে বড় কাছারিতে এসেছে। আজ মনে পড়ে তার কামিনীর কথা। আজ তার আর্জিটা বড়-বাবুকে জানাবে।

বসন্তপুর জলকরে যদি বদলিটা পায় বড় একটা সমস্যার সমাধান হবে?

আজ সেই কথাটাই বলার জন্য এসেছে বিভূতি বিশ্বাস।

হারাধনবাবু কেশব ঘুঘুকে তাড়িয়ে চুপচাপ বসে কি ভাবছে।

বেশ বুঝেছে এবার ওইসব বাজে লোকই রাতারাতি সমাজে মাথা তুলবে। সবকিছু লুটে পুটে খাবে।

তাই একটা শেষ পথই নেবেন হারাধনবাবু। বিষয় সম্পত্তি যতটা সম্ভব সরিয়ে ফেলেছেন—বাকী ওই জলকর কিছু জমি সেটার উপর আর তার লোভ, মোহ নেই। এমন সময় বিভূতিকে ঢুকতে দেখে চাইলেন হারাধনবাবু।

বিভূতি কাছারিতে টাকা কড়ি জমা দিয়ে কত্তার ঘরে ঢুকেছে। আজ যে ভাবেই হোক কথাটা জানাবে। ওই বদলির কথা।

হারাধনবাবু শুধোন —কি খবর হে বিভূতি?

—বিভূতি বলে ভালোই আজ্ঞে। একটা নিবেদন ছিল।

—নিবেদন! হারাধনবাবু ওর দিকে চেয়ে বলেন।

—তা করে ফ্যালো। এত ইতি উতি কেন!

বিভূতি আজ জানায় তার সংসারের কথা। মায়ের বয়স হয়েছে। বিয়েও করেছে। ছেলেপুলেও হয়েছে। দিন দিন সংসারের খরচ খর্চাও বাড়ছে। তাছাড়া বাড়িতে দুটি মেয়ে আর কাচ্চা বাচ্চা।

ওদের ফেলে দূর জলকরে পড়ে থাকতে হয়। তাই বলছিলাম কত্তাবাবু, আপনাদের বসন্তপুরের জলকরটা আমাদের গেরামের পাশেই। ওখানেই যদি কাজটা বদলি করে দিতেন ঘরের খেয়ে কাজ দেখতে পারতাম। সংসারেরও একটুন সুবিধা হতো!

হারাধনবাবু কি ভাবছেন?

দেখছেন তিনি বিভূতি বিশ্বাসকে।

বিভূতিকে দেখে কি ভাবছে হারাধনবাবু।

ছেলেটা সৎ আর করিতকর্মা। ভেড়ির কাজ খুব ভালো বোঝে। তার ভেড়িতেই আয় অনেক হয়েছে।

হারাধনবাবু বলে—এ্যাই শালা বসন্তপুরের ভেড়ি তুই চালাতে পারবি ?

—আজ্ঞে।

বিভূতি অবাক হয়ে কথাটা শুনে।

বসন্তপুর-এর ভেড়ি তার গ্রামের লাগোয়া। বেশ বহাল ভেড়ি। জলকরও বিরাট। বিভূতি ওখানেই যেতে চেয়েছিল। আজ মালিককে নিজে থেকে ওই ভেড়ি চালাবার কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছে সে। চেয়ে দেখছে মালিককে।

হারাধনবাবু ধমকে ওঠে—কিরে ব্যাটা ? হাঁ হয়ে গেলি যে। বসন্তপুর তো তোর গাঁয়ের কাছেই। ওই ভেড়ি তোকে যদি ইজারা দিই—পারবি চালাতে ?

—আমাকে ইজারা দেবেন ? বিভূতি ভাবতেই পারে না সে সরকার থেকে ভেড়ি মালিক হবে। তার এসব ছিল কল্পনা।

হারাধনবাবু বলে—তবে আর বলছি কি ; সরকার তো নিয়ে নেবে, তার চেয়ে তুই চালা। ওই জলকর তোর নামে।

বিভূতি এবার কিছুটা বুঝেছে ব্যাপারটা।

তবু বলে সে—আজ্ঞে প্রথম মাস ক'তো হাতির খরচা ঠেলতে হবে, টাকা কোথায় পাবো ?

হারাধন ধমকে ওঠে—তখনই বলেছিলাম শালা চুরি ফুরি কর, তা করলি না। এখন বলে টাকা কোথায় পাবো ? শালা ইষ্টুপিট কোথাকার। আবার বে—করেছে। বাপ হয়েছে।

—বিভূতি চুপ করে থাকে।

জানে সে হারাধনবাবুকে। এসময় কথা বললে আরও বেশী মুখ

খিস্তী করবে মালিক। তাই চুপ করে থাকে।

বুড়ো হারাধনবাবুরই যেন গরজ।

তাছাড়া কেশব তার মেজাজ বিগড়ে দিয়ে গেছে।

কেশবকে দেখিয়ে দেবে হারাধনবাবু সে টাকার প্রত্যাশী নয় আজও।

—বলে সে দশ হাজার টাকাতে হবে?

মাথা নাড়ে বিভূতি—তা চালিয়ে নেব।

—হারাধনবাবু বলে ঠিক আছে। কালই আয় লেখাপড়া করে দোব। তবে ষোলয়ানা ইজারার টাকা আর এই দশ হাজার টাকা এক বছরের মধ্যে দিতে হবে। কিরে, দিবিতো।

বিভূতি মনে মনে তখন তার ভেড়ির অভিজ্ঞতা দিয়ে হিসাব সুরু করেছে। এক বছর নয় ঠিক চললে ছ-মাসেই সব উঠবে। কিছুটা ভরসা পেয়ে বলে সে।

—তাই দোব বাবু।

—হারাধনবাবু বলে দেখিস, কথার যেন নড়বড় না হয় শালা। তাহলে কাল আয়। আর শোন সরকার থেকে ভেড়ির মালিক হয়ে যেন ল্যাজ না গজায়। তাহলেই কিন্তু মরবি। জানবি মা লক্ষ্মীর প্যাঁচার পাখনা আছে রে—গড়বড় দেখলেই মা লক্ষ্মীর প্যাঁচা উড়ে যাবে। ফুরুৎ করে ধা হয়ে যাবে॥

বিভূতি বিশ্বাস পরদিনই কাগজ পত্র নিয়ে মুনিবকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

কামিনী অবাক হয় সব শুনে।

তখন কোলে তার বড় ছেলে বিষ্টু এসেছে। কামিনী স্বামীকে জল বাতাসা দিয়ে হাওয়া করতে করতে শুধোয়। হঠাৎ চলে এলে যে ভেড়ি থেকে।

—বিভূতি বলে ওখানের চাকরী ছেড়ে দিতে হল বিষ্টুর মা।

চমকে ওঠে কামিনী।

ওই চাকরীটুকুই তাদের ভরসা। ওই দিয়েই সংসার চলে। এখন সেই অবলম্বনটুকু চলে যেতে কামিনীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

সে বলে সেকি গো? তাহলে দিন চলবে কি করে? বিভূতির স্ত্রী মুখ চোখে ভয়ের ছায়া দেখে হাসতে হাসতে বলে—দিন ঠিকই চলে যাবে বিষ্টুর মা। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি! এত ভাবছিস কেন?

এতবড় স্তোকবাক্যটা মানতে পারে না কামিনী।

বিভূতি বলে—এত ভাবছো কেন গো? মালিক আমাকে বসন্তপুরের ভেড়ির ইজারা দিলেন। আমাকেই ওই ভেড়ি চালাতে হবে।

—সেকি গো! অয় বাপ। কামিনী এবার চমকে ওঠে।

কামিনী সেই ভেড়ি দেখছে। দেখছে ভোরে বাঁক ভর্তি কত মাছ যায় ওখান থেকে বামুন ঘাটার কাঁটায়। তার বাড়িতে সব দিন মাছই জোটে না, বিষ্টু কাঁদে মাছের জন্য, আজ সেই বিরাট ভেড়ির মালিক হতে চলেছে ওরা। কামিনী দু-হাত জোড় করে কোন অদৃশ্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলে।

—একটা টাকা ষোল আনা দাও বাপু, মা কালীর থানে পুজো দিতে হবে। মা মুখ তুলে চেয়েছেন।

বিভূতি বিশ্বাস ক্রমশঃ ভেড়িতে এবার জাঁকিয়ে বসে। এতদিনের অভিজ্ঞতা আর তার নিষ্ঠার জন্য ভেড়ির লোকরাও খুশী। তারাও ভালোভাবে কাজ করে।

বিভূতি নিজেই দিনরাত ভেড়িতে পড়ে থাকে। নিজের হাতে কাজ করে, নিজে যায় পোনা আনার জন্য কোলাঘাট, কোথায় শালগোলা। সরেস ডিম এনে বাড়ির কাছের পুকুরে ডিম ফোটায়। তাক্ বাক্ তার জানা। সেই পোনা ভেড়িতে ছাড়ে।

বিষ্টুও ক্রমশঃ বাবার সঙ্গে থেকে কাজ শিখছে।

বিভূতি ভোরে মাছ-এর ভারিদের নিয়ে কাঁটায় আসে। তার

ভেড়ির মাছ-এর কদরও আছে। ভালোই দাম পায়।

বিভূতি বিশ্বাসের ভাগ্য যে এমনি করে বদলে যাবে হঠাই এটা কেউ ভাবেনি।

হাটতলায়, এলাকাম গ্রাম গ্রামান্তরে অনেকেই খবরটা শুনেছে। অবশ্য প্রথমে তারা কেউ বিশ্বাস করেনি।

—অনেকেই বলে মাথা খারাপ হয়েছে তোমাদের। বসন্তপুরের ভেড়িও হারাধনবাবুর। বেচারা কাজের সুবিধার জন্য 'এখানে বদলি নিয়ে এসেছে। আর কাজের বোঝাও ওর ঘাড়ে চাপিয়েছে মালিক।

ভেড়ি দেবে ওকে ওই হারাধন নস্কর। ওকে! অবশ্য বিভূতিকে দেখে মনেই হয় না যে এই বসন্তপুরের জলকরের এখন মালিক সেই-ই।

বিভূতিও কথাটা কাউকে জানায়নি বাইরে। জলকরের কাজ যে ভাবে চলছিল তেমনিই চলছে। তার আয় কিছু বেড়েছে।

বিভূতি দিনরাত ভেড়িতেই পড়ে থাকে।

এখন তার পাশে দাঁড়িয়েছে তার ছেলেটাও। বিষ্টুও কাজ শিখেছে বাবার কাছে। হিসাবপত্র রাখে, ভেড়িতে জাল টানয়ে। নিজেই মাছ ওজন করায়। পোনা ফেলার বছর, পোনার রকম, কোন ডিমে সরেশ মাছ হবে এসব তাক বাগ, ছেলেকে শিখায়।

আর যেমন খাটছিল তেমনিই খাটে।

বরং বেশীই খাটছে। বাড়িতে দুপুরে একবার খেতে যায়। কোনমতে নাকে মুখে খাবার গুঁজে ছাতি মাথায় দিয়ে দুপুরের রোদে আবার জলকরের আলো ঘরে এসে হাজির হয়।

—কামিনী বলে, শান্ত হয়ে খেয়ে একটু জিরিয়ে তবে যাও। তা নয় খেয়েই দৌড়তে হবে? সকালের কাজ তো হয়ে গেছে।

—হাসে বিভূতি। কাজের কি শেষ আছে রে বৌ। সবে জলকর হাতে পেয়েছি। এখনও কত্তাবাবুর দেনা মিটানো হয় নি। কামিনী দেখেছে প্রতিদিনই বিভূতি মাছ বিক্রি করে সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখে।

বাড়ির খর্চা তেমন বাড়ায় নি। বিভূতির হিসাবটা সেদিকে ঠিকই আছে।

মা ক'মাস আগে মারা গেছে।

অবশ্য বিভূতি মায়ের শ্রাদ্ধে সাধ্যমত খরচ করেছিল। জাত-জ্ঞাতদের ঘটা করে খাইয়ে ছিল।

তখনও লোকে জানতো হারাধনবাবুরই কর্মচারী ও। সুতরাং সামান্য মাইনের তুলনায় একটু বেশীই ঘটা করে খর্চা করেছিল।

—বলে বিভূতি মাতৃদায় বলে কথা। সাধ্যমত করতে হবে তো কাজকর্ম।

এখন বাড়ির সব ভার কামিনীর উপর। বিষ্টুর পর এসেছে কেষ্ট। ছেলেটাকে স্কুলে পড়াচ্ছে। তবে লেখাপড়ার চেয়ে ওর নজর বেশী দুষ্টুমির দিকে। কামিনী সামলাতে পারে না। মাঝে মাঝে মারধোর ও করে। গজগজ করে।

—একটা বাঁদর হয়েছে!

হাসে বিভূতি—ছেলেপুলে দুষ্টু তো হবেই। এত মারধোর করো কেন!

—কামিনী বলে একদিন বাড়িতে থেকে ছাখো না কেমন বাঁদর হয়েছে!

কিন্তু সে সময় নেই বিভূতির। তার মাথায় এখন নানা কাজের কথা ঘুরছে। হারাধনবাবুদের দেনা এখনও মিটোতে পারেনি। তবে টাকা সে জমাচ্ছে বহু কষ্ট করে।

তার জলকরে এখন মাছও বেশ বেড়েছে। ওই পচা খাল থেকে পাইপ লাগিয়ে নিজের পাম্পসেট দিয়ে পচা জল তুলে নিয়মিত ছাড়ছে তার ভেড়িতে।

ওই জল মাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য।

তার জলকর ওই পচা খালের কাছে তাই এই বিশেষ সুবিধাটা

সে পেয়েছে।

অবশ্য এর জন্য পঞ্চায়েতকে কিছু প্রণামী দিতে হয়। তা দিয়েও বিভূতির প্রভূত লাভই হয়েছে।

বিভূতি আরও একটা মাঝারি পুকুরকে কাজে লাগিয়েছে।

ওই পুকুরটা তাদের জলকরের কাছারি বাড়ির গায়েই। ধারে প্রচুর কলা আর নারকেল গাছ।

ক্রমশঃ নারকেল গাছগুলো মাথা তুলছে। ওর ফল থেকেও বেশ কিছু টাকা আসবে।

—আপাততঃ বিভূতি তার জলকর থেকে কেজি খানেক, দেড় কেজি সাহিজের পোনা তুলে ওই পুকুরে ছেড়েছে। এর মধ্যে মাছগুলো দু-কেজি পার হয়ে গেছে। বিভূতির খুব সখ এই অঞ্চলে বড় সাইজের মাছ কেউ রাখে না।

ও সেই আগেকার মত বড় সাইজের মাছই তৈরী করবে আর লগনসার বাজারে বিশেষ অর্ডার ধরে ওই মাছ সাপ্লাই করবে দুগুণ দামে।

এখনই পুকুরটায় প্রচুর মাছ হয়েছে। আর জলকরের মাছই রোজ বিক্রী করে।

অনেকেই বলে হাটতলায়।—কত খাটবে বিভূতিদা। মালিক কত দেয়? হাসে বিভূতি—

এখনও পরনে সেই এইটুন ধুতি, ফতুয়া। শীতকালে মাথায় একটা রং চটা কমফর্টার জড়ায় আর গায়ে দেয় ধুসো খাদির চাদর।

—বিভূতি বলে তবু কাজ করতে হবে তো।

কেশব ঘুঘুর এখন দিন কিছু বদলেছে। সুযোগসন্ধানী, লোভী, বোরোয়া ব্যক্তি সে। লাজ-লজ্জার বালাই নেই। ও দেখেছে জমিদারী চলে যাবার মুখে যে ভাবে হোক কিছু জমি, জলকর হাতিয়ে নিতে হবে।

আর হারাধনবাবু তাকে তাড়িয়ে দেবার পরও সে নিরস্ত হয় নি।

কারণ কেশব ঘুঘু জানে হারাধনবাবু ছাড়াও অন্য জমিদাররা আছে যাদের কাছে দু'এক হাজার টাকাই অনেক।

তাই এর মধ্যে ঘুরে ফিরে কেশব কিছু জমি—সামান্য হাজা মজা জলকরের মালিক সেজে বসে একেবারে বদলে গেছে।

সে দেখেছে যার লাঠি তারই মাটি। বিশেষ করে এই যুগে।

তাই এর মধ্যে কেশব ঘুঘু দু-চারজন অন্ধকারের লোকদেরও হাতে এনেছে।

ডামাডালের বাজারে এখন জমিদার ভেড়ি মালিকরা একটু বেদায়দায় পড়েছে। ভেড়ি চালাতে হচ্ছে তাই চালাচ্ছে। তাদের সেই আগেকার মতো রমরমা নাই। ভেড়িতে লোকজন ঠিকমত কাজ করে না। বেশী ধমক দিলে বিগড়ে যাচ্ছে। তারাও বুঝেছে বাবুদের সেই তেজ আর নেই।

কেশব ঘুঘু সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে। তার দলবল নিয়ে সে রাতের অন্ধকারে কোন জলকরে হানা দেয় দল পত্র নিয়ে।

অবশ্য সেইসব ভেড়ির লোকদেরও কাউকে হাত করে এই কাজে নামে তবু বাধাও আসে।

কিন্তু কোনমতে বেশ কিছু মাছ চুরি করে পালায় তারা। এমনি করে এই অঞ্চলের অনেক মেছো ভেড়িতেই রাতে হানা পড়ে। বেশ কিছু মাছও চুরি যায়।

কেশব ঘুঘু আড়ালে থেকে মোটা বখরা পায়।

কেশবঘুঘু এখন পয়সা হাতে পাচ্ছে। এতদিন ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে ঘুরেছে। এখন রহিম আদমীর মতই ঘোরে দিনের বেলায়।

পঞ্চায়েতের মেম্বারও হবার চেষ্টা করছে। তার জন্য খর্চাও করেছে। জানে কেশব একবার পঞ্চায়েতের মেম্বার হতে পারলে এসব খরচ খর্চা সে সুদসমেত আদায় করে নেবে।

কেশবঘুঘু ভোলেনি হারাধনবাবুর সেই অপমানটা। তাকে কাছারি

বাড়ি থেকে লোক দিয়ে বের করে দিয়েছিল। তাকে ওই বসন্ত-পুরের জলকর দেয় নি।

কেশব ঘুঘু তাই নজর রেখেছিল ওই জলকরের উপর। প্রথমে সেও সন্দেহ করে নি যে ওই জলকর এর স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছেন হারাধন-বাবু। ভেবেছিল কেশব ওটা এখনও হারাধনবাবুরই রয়েছে, বিভূতি ওখানের কর্মচারী মাত্র। সেই তদারক করে মাছ বিক্রী করার।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ স্থানীয় ব্যাঙ্কে গিয়ে একটু অবাক হয় কেশব।

এখন হাটতলার ওদিকেই ব্যাঙ্ক গজিয়ে উঠিছে। আগে টাকাকড়ি সাধারণ মানুষের হাতে বিশেষ আসতো না।

যা আসতো তা দিন চালাতেই বের হয়ে যেতো। সঞ্চয় করার কথাই ছিল না। সম্ভবও ছিল না।

কিন্তু এখন দিন বদলাচ্ছে। দোকানদার—ব্যবসায়ী থেকে চাষী গৃহস্থরাত এখন টাকাকড়ি ঘরে রাখে না। ব্যাঙ্কগুলোও সেই খবর জলে গ্রাম গ্রামান্তরে অফিস খুলেছে।

সেখানে জমা পড়ছে সাধারণের টাকা।

কেশবও এখন ব্যাঙ্কে টাকা রাখছে। কিছু স্বনামে কিছু অন্য নামে। ইচ্ছা আছে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে একটা বরফকল বসাবে।

জায়গাও আছে তার, টাকাটা নিতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে। মাছের তেলেই মাছ ভাজবে কেশব।

সেদিন ব্যাঙ্কের বাবুদের ওখানে বসে গল্প করছে কেশব। এর মধ্যে বাবুদের চা-পান-বিলাতী সিগ্রেট খাইয়ে, কাউকে বিলাতী মদের বোতল জুগিয়ে সে এখন ওদের কাছের মানুষ হয়ে গেছে।

হটাৎ দেখে কাউন্টারে এসে বিভূতি চাদরের নীচে থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে নিজের হিসাবেই বেশ কিছু টাকা জমা দেয়।

ব্যাপারটায় কেমন ঘটকা লাগে কেশবের।

—ব্যাটা নিজের হিসাবে টাকা জমাচ্ছে? ব্যাঙ্কের কেরানী বলে।

—প্রায়ই জমা দেয় টাকা। বেশ সলিড কাষ্টমার কই বিভূতিবাবু?

কেশব অবাক হয়।

— তাই নাকি! এত টাকা জমাচ্ছে বিভূতি সরকার!

তার পরই কেশব খোঁজ খবর নিতে শুরু করে।

অবশ্য গুজবটা সে শুনেছিল, কিন্তু বিভূতি যে এত পেয়েছে ওটা মানতে চায় নি তখন কেশব।

সেটেলমেন্ট অফিস কেশবকে প্রায়ই যেতে হয় নানা ধান্ধায়।

সেখানেও তার জাল বিছানো।

আর তাই খোজ খবর নিতেই ব্যাপারটা বের হয়ে পড়ে। চমকে ওঠে কেশব ঘুঘু।

ওই জলকর পাবার কথা তারই। দর দামও করতে গেছল। না হয় আরও বেশী দামই দিত হারাধনবাবুকে।

কিন্তু কই হারাধনবাবু তার কোন কথা না শুনে তাকে বের করে দিয়েছিল।

আর আজ সেই জলকর তুলে দিয়েছে ওই বিভূতি বিশ্বাসের হাতে। যে তাদের কাছারিতে সামান্য সরকারের কাজ করতো তাকেই বানিয়ে দিল ভেড়ির মালিক কেশব ঘুঘুকে তাড়িয়ে দিয়ে।

কেশব রাগটা মনের অতলে চেপে বের হয়ে এল। আজ এতবড় অপমান সে মুখ বুজে সইবে না।

দেখিয়ে দেবে ওই হারাধনবাবুকে, আর বিভূতিকে যে তাকে চটিয়ে এখানে কিছু করা খুব সহজ কাজ নয়।

একটা নতুন যুগের ভবিষ্যৎ গতিনিধি বসেই নিজেকে মনে করে কেশব।

সেদিন বিভূতি হাটে মাছ-এর আড়তে গেছে। মাছ বিক্রী হচ্ছে।

এমন সময় কেশব এসে পড়ে তার সেই জোপেত 'হাকিয়ে'— আরে বিভূতি যে! ভালো আছো?

কেশব মুখে মিষ্টি কথা বেশ ভালোই বলতে জানে। বিভূতি বলে। হ্যাঁ।

—কাজকর্ম কেমন চলছে ?

বিভূতি তাকায় ভালোই।

কেশব না তাকার ভান করে বলে তা কর্তাদের জন্য খেটে তো রক্ত জল করছো—তোমার কি লাভ হলো ?

বিভূতিও জবাব দেয়। দিন তো চলছে। ছেলেটাকে ঢুকিয়েছি কাজে। বাপ বেটায় কাজ করছি। চলে যাচ্ছে কোনমতে।

কেশব বুঝেছে বিভূতি আসল কথাটা জানাতে চায় না। কেশব বলে অনেক দিন যাই নি ওদিকে।

বিভূতি বলে। চা খেয়ে আসবে—কিছু ভেড়ির মাছ নিয়ে যাবে।

বিভূতি কেশবকে চটাতে চায় না।

কেশবেরও ওই জলকরের বর্তমান হাল চাল জানার দরকার। নিজের চোখে সেটা দেখতে চায়। তাই এসছে বিভূতির সঙ্গে জলকরের কাছারিতে। আর এসেই অবাক হয় কেশব।

কাছারির জমিতে নানা ফল ফসল হচ্ছে, বাগানে প্রচুর কলা হয়। নারকেল গাছও প্রায় শ খানেক মাথা তুলছে।

চারিদিকে বেশ শ্রী ছড়িয়ে পড়েছে। বিভূতি বলে পড়েছিল, এবার লাগালাম। গাছ গাছালিতে জায়গাটা ভরে গেলে ঠাণ্ডা হবে জায়গাটা।

বিভূতিই দেখায় সামনের পুকুরে তার বড় সাইজের মাছের চাষ। বলে সে-লগণসার বাজারে মাছ আর এদিক থেকে যায় না। আমি তাই বড় মাছ এর চাষও রেখেছি। তিনবার কেজি সাইজের লাল রাজপুত্রের মত রুই মাছগুলো ঘাই মারছে।

কেশব ঘুঘু দেখেছে বিভূতি এই জলকরকে নিজের মত সাজিয়েছে। এ তার নিজস্ব জিনিসই।

কেশব ঘুঘুর মনটা কি নীরব জ্বালায় জ্বলে ওঠে। বিভূতি তাকে বেশকিছু মাছও দেয়।

মাছভাজা, চা খেয়ে কেশব ঘুঘু বিদায় নিতে এবার বিভূতির ছেলে বিষ্টু এগিয়ে আসে।

তরুন তরতাজা বলিষ্ঠ বিষ্টু বাবার যেন যোগ্য সন্তান। নিজের হাতে কাজ করে।

জালও টানে দরকার হলে। নৌকা বয়। দরকার হলে বহু মাছের ঝুড়ি ভ্যান রিক্সায় তুলে নিজেই দু'মাইল ভেড়ি পথ রিক্সা চালিয়ে হাটে চলে যায়।

বিষ্টুও চেনে কেশব ঘুঘুকে।

সেও শুনেছে আশপাশের ভেড়িতে মাছ প্রায় লুট হচ্ছে আর সে সবের মূলে ওই কেশব ঘুঘুই।

তার দলবলকেও চেনে বিষ্টু।

আজ সেই ধুরন্ধর কেশবকে এখানে এসে চারিদিকে নজর দিয়ে ঘুরতে দেখে ভালো লাগেনি বিষ্টুর।

তাই কেশব চলে যেতে বিষ্টু এসে বাবাকে বলে—ও কেন এসেছিল এখানে?

বিভূতি বলে পুরোনো লোক চেনা জানা—

—ও লোক সুবিধের নয় বাবা। অনেকে অনেক কথাই বলে ওই কেশবকে নিয়ে। ওর দলবলও ভালো নয়।

বিভূতি বলে—না-না। কেশব এর সঙ্গে আমাদের গোলমাল তো নাই।

বিষ্টু বলে—সাপের সঙ্গে মানুষ তো গোলমাল করে না বাবা। কিন্তু তাক্ পেলেই সাপ ঠিকই ছোবল দেয় মানুষকে। ওই কেশব সাপের জাত বাবা। ওকে বিশ্বাস নাই।

বিভূতিও কথাটা বিশ্বাস করে।

বিষ্টু বলে—ক'দিন একটু নজর রাখতে হবে বাবা।

বিভূতিও সায় দেয়। তাই দেখছি। ওকে ডেকে এনে মনে হয় ঠিক করি নি। তুই ঠিকই বলেছিস বাপ্।

ভাবনায় পড়ে বিভূতি।

বাড়িতে কামিনী বলে এত কি ভাবছো?

বিভূতি সব কথা বলতে পারে না।

অনেক ভাগ্য ফলে এই জলকর হাতে পেয়েছে। একে সে প্রাণপাত পরিশ্রমে বাড়িয়েছে। আরও বাড়াতে পারবে ব্যবসা।

কিছু পয়সা জমলে অন্য লাগোয়া জলকরও কিনে নিয়ে তাকেও চালু করে দেবে। দিন বদলাবে তার।

কিন্তু এখনও কত্তাবাবুর টাকা শোধ দিতে পারে নি সবে পয়সা আসছে। এই সময় কেশব ঘুঘু যদি কিছু করে বসে সর্বনাশ হবে।

এই সর্বনাশকে ঠেকাতেই হবে।

—কামিনীর কথায় বলে।

—ক'দিন রাতে জলকরে থাকতে হবে।

—সেকি!

বলে বিভূতি হ্যাঁ বৌ।

কামিনী অবাক হয়।

কিন্তু বিভূতিও মানর অতলে জোর পায়। এ তার নিজের হক্—একে সে বাঁচাবেই।

বিষ্টুও তৈরী।

সেও তার অনুগত কুলি—লোকজনদের নিয়ে সন্ধার মুখেই কাছারিতে আসে।

ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও এখানে করেছে। আর খাওয়া দাওয়ার পর তাদের ভেড়ির এখান ওখানের টং এ, আলাঘরে পাঠিয়ে দেয়। টর্চ-লাটি, বল্লম-কেঁচা এসবও সঙ্গে থাকে।

বিভূতিও এসে হাজির হয়।

বিষ্টু বাবাকে দেখে বলে—তুমি:

বিভূতি বলে—দিন কাল ভালো নয় রে। এলাম। যা খবর শুনছি।

বিষ্টুর শরীরে তরুণ রক্ত। বলে সে।

আসুক না কোন ব্যাটা আসবে। তাকে ফিরে যেতে দেব না।

আজ বাঁচার লড়াই-এ সেও সামিল হয়েছে কি নতুন উদ্যম নিয়ে।

বৃষ্টি নেমেছে।

শীতের রাত। আর অমাবস্যার অন্ধকার নেমেছে চারিদিকে।

তারার আলোও নেই।

সব তারা ঢেকে গেছে ঘন মেঘের আড়ালে। গাছগুলো জমাট অন্ধকারে হাওয়ায় শন্ শন্ আওয়াজ তোলে।

বাতাসে জাগে ভেড়ির বুকে ঢেউ আছাড় পড়ার শব্দ।

এ যেন এক বিভীষিকার রাত্রি।

জেগে আছে বিভূতি কাছারির উপরের ঘরে।

জলকরের একটা বন্দুকও রয়েছে। খাতাদার দুষণ এমনিতে বেপরোয়া, ভালো বন্দুকবাজ।

দুষণও তৈরী হয়ে আছে।

ভেড়ির চারিদিকে সতর্ক প্রহরা।

বিষ্টু পাঁচসেলি টর্চ হাতে দুজন লোক নিয়ে ওই পুকুরের ওদিকার নারকেল বনের ভিতর বসে আছে সাবধানী দৃষ্টি মেলে।

কেশব ঘুঘু তার কর্মপন্থা ঠিক করেই ফেলেছে। অবশ্য এখানের দু'একজন কর্মীকে তার লোকজন কিছু টাকা দিয়ে হাতে আনার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

তবু কেশব ঘুঘু নিরস্ত হয়নি।

সে জানে তার লোকজন ওই কাজে বেশ পোক্ত। ওরা যেভাবে হোক জাল ফেলে ভেড়ির সরেশ ওই বড় মাছগুলোকে তুলে আনবেই।

তার জন্য দরকার হয় সে এই অভিযানে ওদের সাহস যোগাতে নিজেই যাবে।

ভেড়ির পথঘাটও সে নিজে দেখে এসেছে।

তার অনুচররাও চেনে।

ওরা ওই জলকরে হানা দেবে না—ওখানের মাছ ছোট। চারাপোনা।

সে হানা দেবে বিভূতির ওই বড় মাছের পুকুরে। প্রচুর মাছ সেখানে। কয়েক খেয়া টানতে পারলে আট দশ হাজার টাকার মাছ উঠবে।

আর সর্বোপরি ওখানে হানা দিয়ে ফিরে আসতে পারলে বিভূতি মাছ, হারাধনবাবুও বুঝবে কেশবকে চটিয়ে তারা ভুল কাজই করেছে।

কেশব আজ ওই বৃষ্টির রাতেই হানা দেবে ওই বিভূতির জলকরে। তার জন্য একটা ম্যাটাডোর ভ্যানও ঠিক করেছে। তাতেই যাবে লোকজন-জাল-হাতিয়ার পত্র নিয়ে। আর কাজ সেরে ফিরে আসতে পারবে তাড়াতাড়ি।

বৃষ্টির রাত। ঝড়ের শব্দ, মেঘের গর্জনও রয়েছে। ভ্যানের আওয়াজও সহজে শোনা যাবে না। হেড লাইট নিভিয়ে তারা চলে যাবে জলকরে যাতে সহজেই হানা দেওয়া যায়।

সেইমত ওই দুর্যোগের রাতে চলেছে তারা।

সাবধানে গিয়ে হাজির হয় ভেড়ির ওদিকে।

দূরে কাছারি বাড়ি—গাছ-গাছালি মাথা তুলেছে।

অন্ধকার তেমন কিছুই দেখা যায় না।

গাড়ি থেকে নেমেছে ওরা, জাল—দামী নাইনলের বিদেশী জাল নিয়ে। বেশ মজবুত জাল। কিছু লোকের হাতে লাঠি-বল্লম-টাঙ্গি।

দরকার হলে ওসবও ব্যবহার করতে হবে। তবে না করতে হলেই ভালো।

চারিদিকে সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে কেশব বলে চুপি চুপি।

—এগিয়ে যা জাল নামা।

ওরাও দেখে নেয় চারিদিক।

এই দুর্যোগের রাতে কেউ কোথাও নাই। দূরে টং গুলো থেকেও কোন আলোর সংকেতও নাই, কেউ বোধহয় জেগে নেই। শীতের রাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে সবাই।

এরা জাল নামিয়েছে।

জাল টানতে পুকুরে যেন হৈ চৈ পড়ে যায়।

তিন চার কেজি সাইজের মাছগুলো দুম দাম করে জলে লাফাচ্ছে।

জাল ভর্তি হয়ে গেছে মাছে।

হঠাৎ তারপরই ওই ভেড়ির চারিদিক থেকে জোরালো টর্চের আলো ছিটকে পড়ে চারিদিকে। আর ছায়া মূর্তির দল কলাগাছ, নারকেল গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরাও বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

ওরা দলেও ভারি।

আর তদের লাঠির আঘাতে কে ছিটকে পড়ে ভেড়ির জলে।

জাল ছেড়ে ওরাও পালাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এবার দুষণের বন্দুক থেকে কয়েক গুলী ছুটে আসে।

কেশব ভাবতে পারেনি যে জাল দিয়ে মাছ ধরতে এসে নিজেরাই এমনি ভাবে জালে পড়বে।

ওই বিষ্টুর দল ওদের তাড়া করেছে। গাড়ির দিকে ছুটছে ওরা।

কিন্তু সেখানে পথ আটকেছে দুষণ।

তার গুলিগুলো অন্ধকারে ছুটে আসে?

কে যেন আর্তনাদ করে ছিটকে পড়লো।

কেশব ওদিকের ভেড়ির আল ধরে ছুটছে। পা পিছলে নোংরা জলের নালায় ছিটকে পড়ে। পচা খালের নোংরা জল আসে ওই দিয়ে।

সর্বাঙ্গে বিশ্রী গন্ধ। বমি আসে।

কিন্তু প্রাণের দায়ে, ছুটলো কেশব নলবনের দিকে। যে ভাবে হোক পালাতে হবে।

সে ধরা পড়তে সমূহ বিপদ হবে। পঞ্চায়েতের সভ্য এখন সে। সামনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

চোর বদনাম দিয়ে তাকে শেষ করতে পারবে না। ওদের যা হয় হোক। এখন তাকে বাঁচতে হবে।

বাকী লোকগুলোও বুঝেছে আজ তাদের বরাতে দুঃখ আছে। হাতের হাতিয়ার ব্যবহার করার সময়ও পায় নি। তারাও যে যেদিকে পারে দৌড়ায়!

আর ভ্যানের ড্রাইভারও বেগতিক দেখে ভ্যান ফেলে পালায় ওদিকের ধান মাঠ দিয়ে।

হৈচৈ—কোলাহল ওঠে চারিদিকে।

ওদিকের গ্রামবসত থেকেও লোকজন ছুটে আসে।

বিভূতি আজ অন্য মানুষে পরিণত হয়।

সে ভাবতে পারে নি সত্যিই এমননি হানা পড়বে। এতদিন জলকরে কাজ করছে সে।

ছোট খাটো চুরি চামারি হয়, হতোও।

কিন্তু এমনি ভাবে দলবেঁধে ডাকাতি করতে আসবে কেউ গাড়ি নিয়ে তা ভাবতে পারেনি। আরও অবাক হয় বিভূতি, সে নিজেও আজ লাঠি নিয়ে এই লড়াই-এ সামিল হয়েছিল। আর রক্ষা করেছে তার সম্পত্তি এমনি ভাবে লড়াই করে।

আজ যেন নতুন একটা আত্মবিশ্বাস এসেছে তার। আর চিনেছে তার ছেলে বিষ্টুকে।

ওর জন্যই এসব রক্ষা পেয়েছে।

বিভূতি বলে—আজ তুইই সব বাঁচালি বাপ?

বিষ্টু বলে—লড়াই করেই এবার বাঁচতে হবে বাবা। শত্রু চারিদিকে। তবু আমাদের কোন ক্ষতিই তারা করতে পারবে না।

সকাল বেলায় লোকজন আরও জুটে যায়।

পুলিশও আসে।

এতদিন ধরে চারিদিকের জলকরে মাছ চুরি শুরু হয়েছে। পুলিশেও খবর গেছে।

কিন্তু পুলিশও কোন সুরাহা করতে পারেনি।

কোন চোরও ধরা পড়েনি।

আজ দু-তিনকে ওরা জালে জড়ানো অবস্থায়। কাউকে ভেড়িতে পড়ে থাকতে দেখে তোলে, একজন লাঠির ঘায়ে পা ভেঙ্গে পচা খালে পড়েছিল।

তাকেও তুলে ওই ঠাণ্ডায় ভেড়ির জলে চুবিয়ে ময়লা মুক্ত করা হয়।

আর ধরা পড়ে দামী বিরাট নাইনলের জালও।

কিন্তু লোকগুলো মুখ খোলে না।

পুলিশ ওই পরিত্যক্ত ভ্যানেই ওদের থানায় নিয়ে যায়। বলে

—এখানে মুখ না খুললেও, ওখানে ওষুধ পড়লেই মুখ খুলবে।

বিভূতি তারপরই মতলবটা কাজে পরিণত করে।

ওই বড়মাছগুলোকেই বেচে দেবে আপাততঃ। না হলে আবার হামলা হবে।

তাই বিয়ের লগনসার মুখেই ওই পুকুরের সব বড় মাছ ধরিয়ে ভালো দামেই বিক্রী করে দেয়।

আর দামও পায় আশাতীত।

সরেস মাছই করেছিল বিভূতি। চারিদিকে খবরও র'টে যায়।

হাঁ মাছ তৈরী করতে জানে বিভূতি বিশ্বাস।

হারাধনবাবুর কাছারির আগেকার সেই বোলবোলাও আর নেই।

এর মধ্যে জমিদারী চলে গেছে।

হারাধনবাবুর ছেলেরা কলকাতায় অন্য ব্যবসা শুরু করেছে।

হারাধনবাবু তবু ফাঁকা মেলায় এই কাছারিতে আসে। কিছু

ব্যবসাপত্র, মাছের কাজ টিমটিম করে চলছে।

তিনিও খবরটা শোনেন।

চারিদিকের ভেড়িতে হানা পড়ছে। আর বিভূতির ভেড়িতে হানার খবরও পান। বলেন।

—সেকি রে! ছেলেটা সৎ! ওর উপরই হামলা হলো! শালারা করছে কি! শান্তিতে কাউকে বাঁচতেও দেবে না?

ওর কাছাছির নায়েব বলে তাইতো দেখছি কত্তাবাবু!'

কয়েকদিন আগের ঘটনা এটা।

তারপর সেদিন বিভূতিকে কাছারি বাড়িতে আসতে দেখে চাইল হারাধনবাবু।

বিভূতির কোন্ পরিবর্তনই হয় নি।

আগেকার মত সেই ধুতি ফতুয়া আর একটা ময়লা চাদর জড়িয়ে এসেছে। পায়ে টায়ার কাটার চটি। হারাধনবাবুকে ঘরে ঢুকে প্রণাম করে দাঁড়ালো।

হারাধনবাবু বলেন। কি রে, সব গেছে? শালা ব্যবসা চালাবে? জলকর এর মালিক হবে? সখ মিটেছে শালার? কুঁজোর সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে। বোঝ মজা এবার। গেল তো সর্বস্ব!

তোরও, আমারও!

বিভূতি মাথা নীচু করে হাতের ময়লা ব্যাগ থেকে তাড়াবন্ধী নোট-গুলো বের করে হারাধনবাবুর পায়ের কাছে ফরাসে রেখে বলে।

—আজ্ঞে, যায়নি কিছুই আপনার আশীর্বাদে। তাই তো আপনার টাকাটা নিয়ে এলাম।

দেনা দিয়েছিলেন দশ হাজার, আর সেলামী তখন কিছু দিতে পারিনি। এখন দশ হাজার একটাকা রাখুন। পরের কিস্তাতে আরও কিছু দেব।

অবাক হয়ে দেখেছে ওকে হারাধনবাবু।

যেচে এতদিন পর মৌখিক দেনার টাকা শোধ দিতে আসে কেউ

তা জানা ছিল না হারাধনবাবুর। তাকে দেখে হঠাৎ হেসে ওঠেন হারাধনবাবু।

বলেন—বলিস কি রে! এ্যাঁ

হাসছেন তিনি।

হারাধনবাবু হঠাৎ হো হো করে হেসে বলে শালারা এতদিন ধরে বসন্তপুর ভেড়িতে আমাকে ডুবিয়েছিল রে' বলে লোকসানের ভেড়ি! তুই শালা ছ-মাসে এ্যাতো লাভ করেছিস ওখানে?

বিভূতি বলে—আপনার দয়ায় কোন মতে করে খাচ্ছি।

হারাধনবাবু বলে—আরও খাবি তুই! তুই শালা মহা ধড়িবাজ!

বিভূতি চুপ করে থাকে।

ক'টা বছর কেটে গেছে।

বড় ছেলে বিষ্টু এখন বিভূতির দোসর হয়ে উঠেছে। বিভূতি আশ-পাশের দু'একটা ভেড়িও কিনেছে, আর ভেড়ির জায়গাটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে।

বিস্তীর্ণ এলাকাতে লাগিয়েছে হাজার খানিক নারকেল গাছ, আলাঘরের জমির চারিদিকে লাগিয়েছে কলমের আম, লিচু, পেয়ারা-সবেদা গাছ, উর্বর ভেড়ির মাটিতে নধর সবুজ হয়ে উঠেছে।

নারকেল গাছে চার-পাঁচ বছরেই এসেছে ফলের গুচ্ছ। লোকে বলে—বিভূতি বিশ্বাসের হাত-পয়া আছে হে। ছোঁয়া লাগলে সোনা ফলেছে।

বিভূতির এখন বয়স হলেও দেহটা কঠিন, কর্মঠ।

বিষ্টু ওই ভেড়িতে থাকে, আর বিভূতি বিশ্বাস এখন ভোরে উঠেই কাঁটায় যায়।

বসন্তপুরের বাজার এখন জমে এসেছে।

ক'বছরের মধ্যে এই অঞ্চলেও খালের ধার বরাবর অনেক লোকালয় গড়ে উঠেছে। আগে এদিকে লোকজন বিশেষ ছিল না। গ্রাম বসত ছিল আশপাশে। ময়লা খালের পরিসরও বেড়েছে। এখন যেন গভীর নদীর মতই।

আর ওর দুপাশের পতিত জমিতে এসে বসবাস করে পূর্ববাংলার বহু ঘরছাড়া মানুষ। খালের ধার বরাবর একটা রাস্তামত ছিল।

ওটা ছিল খালের ইনস্‌পেকশন রোড।

কর্পোরেশনের লোকজন খাল দেখাশোনা করার জন্য খাল থেকে ভেড়িতে জল নেবার পয়সা আদায়ের জন্য যাতায়াত করতো।

কদাচিৎ দু'একটা গরুর গাড়ি যাতায়াত করতো ধানের পাটের সময় দক্ষিণ দিক থেকে তিলজলা তপসের দিকে. এখন ওই রাস্তাটায় পিচ হয়ে গেছে।

তপসে থেকে ধাপা হয়ে আরও দক্ষিণের আবাদ অঞ্চলের দিকে বাস যাতায়াত করে, ট্রাক যায় সোজা আবাদের সন্দেশখালি, আমঝাড়ি আর দক্ষিণে বাসন্তীর গাং এর ধার অবধি।

ফলে এখন নতুন জনপদ, হাট-দোকান পয়সার গড়ে উঠেছে নবা-খালের ধারে বসন্তপুরেই। ডাক্তারখানা, কাপড়ের দোকান, বড় মুদিখানা, কয়লার আড়ত, আটা চাকি সবকিছু। আর গড়ে উঠেছে বিরাট মাছের বাজার। তিনরাস্তার মোড়—তাই ভোরেই এখানে আসে ভেড়ি অঞ্চলের প্রচুর মাছ, আর ট্রাক টেম্পো নিয়ে হাজির হয় বজাবজ, এদিকে নৈহাটি, বারাকপুর, কলকাতার শিয়ালদহ, মাণিকতলা, বেলগাছিয়ার মাছের মহাজনরা।

বিভূতি বিশ্বাসই সেদিন একক চেষ্টায় এই মাছের বাজার গড়ে তুলেছিল এখানে। একটা থেকে তার ভেড়ির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনটিতে।

হারাধনবাবু মারা যেতে তার ভাইপোরা ভেড়ি ব্যবসা চালাতে না পেরে এদিকে আর একটা ভেড়িও ছেড়ে দেয় বিভূতি বিশ্বাসের

হাতে।

আর একটা ভেড়ি কিনেছিল বিভূতি বিশ্বাস নিজে।

লোকটা কিন্তু এত বড় হয়েও বদলায় নি।

একটা ছোট ধুতি, আর ফতুয়া। শীতকালে তার উপর একটা ধুসো চাদর চাপিয়ে ধুলি ধুসর কেডস্ পরে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

গদিতে বসে হিসাব দেখে, কাঁটায় ওজন দেখে নিজে, বসন্তপুরে সেই তার ভেড়ির মাছের বাজার বসায়, তারপর এই অঞ্চলের ভেড়ির মাছও এখানে আনতে থাকে বিভূতি বিশ্বাসের আড়তে।

বিভূতি নামটা এখন বিশ্বাসেই পরিণত হয়েছে। সকলেই বিশ্বাস মশাইকে এক ডাকে চেনে।

বিশ্বাস মশাই এর আড়তে তাই মাছও আসে প্রচুর। সাফ সাফ ওজন, নগদ দামও মেলে। আর বাইরের খদ্দেররাও আসে ভিড় করে এখানে।

বুড়ো বিশ্বাস মশাই বলে—ধর্মের কাঁটা বাবা সকল, ওজন দেখে নাও, দাম বুঝে দাও। আমার কয়ালি বুঝিয়ে দাও। ব্যস বাত খালাস।

বিশ্বাস মশাই সরকারকে দিয়ে সকলের কেনাবেচার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে এবার বাড়ির পথ ধরে। ব্যাঙ্কে এখন বসন্তপুরেই অফিস করেছে। সুতরাং ঝামেলাও নেই।

বিশ্বাস মশাই এবার পায়ে ভেড়ির পথ ধরে এগিয়ে চলে। বেশ পথ। দুদিকে ছোট বড় ভেড়ি, মাঝে মাঝে দু-চার ঘর লোকের বসতি, কিছু ধানি জমিতে বোরো ধানও হয়েছে। দূরে দেখা যায় আকাশ সীমায় ধাপার ময়লার পাহাড়ের উঁচু রেখাগুলো।

রোদটা বেশই লাগে এখন।

আগে লাগতো না। এখন চিন চিন করে। চলতেও বুকটান ধরে। লাঠিতে ভর দিয়ে উঁচু বাঁধে উঠতে হয়।

এখন চৈত্রের শুরু। বিভূতি বিশ্বাস এর মনে পড়ে তখন চৈত্র

কিস্তীতে ভেড়িতে ধুম ধাম করে পুজো হতো। নোতুন করে মাটি কেটে ভেড়ির কোল গভীর করা হোত এই সময়। তখন মাছের কিই বা দর ছিল ?

তবু মালিক দুটো পয়সা পেতো। আর শান্তিতে কাম করতো সবাই। এখন ?

দিনরাত ভয় হত এখন।

তার আড়তেই খবর আসে প্রায়ই মাছ চুরি হচ্ছে ভেড়িতে।

সিচকে চুরি নয়, যা হয় তাকে দল বেঁধে ডাকাতিই বলা যেতে পারে। তারাও লাঠি সোটা সড়কি নয়, এবার বন্দুক নিয়ে আসে। বোমা ফাটায় বাধা দিতে গেলে।

সেদিন রাতে পার গোপালপুরের ক্ষুদিরাম ঘোষের ভেড়িতে তো লুঠই হয়ে গেল।

বিভুতি বিশ্বাস লাঠিতে ভর দিয়ে বাঁধে উঠলো। পথে দু'চার জন লোক, মেয়েছেলে যাতায়াত করে। তারা সম্ভ্রম ভরে ওকে পথ ছেড়ে দেয়।

ললিত এর দোকান আছে গঞ্জে, চা পান এর দোকান। সে-বলে।

—এই রোদে বেইরেছেন বিশ্বাস মশাই ? তাও পায়ে হেঁটে।

হাসে বিভুতি।

কেন রে ? হেঁটেই তো জন্ম কাটলো বাপধন ?

ললিত বলে—না, আজ্ঞে বয়সতো হয়েছে। তা দুনম্বরে চললেন নাকি।

ওর দ্বিতীয় ভেড়িকে এরাও দুনম্বর ভেড়ি বলে।

বুড়ি ভাবিনী হাট থেকে ফিরছিল, সে জানে বিশ্বাস মশাইকে বহুকাল থেকে। দেখেছে সেই অতীতে তাকে সামান্য সরকারি করে দিন চালাতে॥

ভাবিনী বলে—আর খামোকা, এত দেড়ি বাঁশ কেনে গো বাছা। সারা জেবনটাতো খাটালে। ছেলেরা এবার লায়েক হয়েছে, আর

কেন ?

হাসে বিভূতি। —বসে গেলেই বসে যেতে হবে রে! তুই এখনও হাটে গন্তে করতে যাস্ কেন ?

ভাবিনী বলে—পোড়া বরাত গো। খেতে দিবে কে ? হাসে বিভূতি, আমার ও তাইরে।

বলে ভাবিনী—হেই মা গো! মা লক্ষ্মী তুমার ঘরে বাঁধা এমন যোগ্যি ছেলে এত ভেড়ি।

হাসে বিভূতি—বাইরেটাই দেখলি রে। চলি ব্যাটারা কি করছে দেখি। যা বাজার প'ড়েছে একদিন না দেখলেই শেষ করে দেবে। ডাকাতের দল সব।

বিস্তীর্ণ ভেড়ির ধারে সারবন্দী নারকেল গাছে ফল ঝুলছে কাঁদি কাঁদি।

ওদিকে দেখা যায় জলশূণ্য বিরাট ভেড়ির বুক। সাদাটে বালিতে ভরে গেছে, লোকজন মাটি কাটছে।

বিভূতি বিশ্বাস এর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে কাজের নমুনা দেখে। চীৎকার করে সে লাঠি তুলে বাঁধের গা বেয়ে নামতে নামতে।

—হেই শ্যালারা। এই তোদের কাজ।

ভেড়ির কোল বরাবর মাটি তুলে যাবি, বুকভোর জল দাঁড়ানো চাই, শালারা টাকের মাথায় কোদালে বুলোবি। সরকার কোথায় ?

ওর চীৎকারে কুলিরা চাইল। সরকারও ছুটে আসে।

এগিয়ে আসে বিষ্টু, ওর বড় ছেলে।

বাবাকে এতখানি পথ রোদে তেতে পুড়ে হেঁটে আসতে দেখে বলে।

—সেকি বাবা, হেঁটে এলে এতটা পথ ? ডাক্তার চলাফেরা নিষেধ করেছে, তুমি কিনা এই রোদে হেঁটে এলে ? যদি মাথা ঘুরে পড়তে ?

বলে বিভূতি—পড়ি নি। এবার তোদের কাজের বহর দেখে পড়বো। এই কাজ ? কবে ভেড়িতে জল পুরবি, সৌসুম এসে যাবে।

পোনা কবে ছাড়বি ?

সরকার বলে,—ওসব হয়ে যাবে।

বিষ্টু শোনায়—এই সপ্তাহেই সব হবে। তুমি বাড়ী চলো, আজ এত কাজ বাড়ীতে পূজো হবে। লোকজন আসবে।

বিভূতি বলে,—তা বুঝলাম! একবার এক নম্বরেও যেতে হবে।

বিষ্টু বলে—আজ ওখানে যেতে হবে না। গাড়িতে ওঠো। ওখানে কেষ্ট আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না।

জোর করে জিপে তুলেছে বিভূতিকে ওরা। বিভূতি বিশ্বাসের এতেও আপত্তি।

বলে সে—হেঁটে চলে যাবো, এইটুকু তো পথ।

হাঁপাচ্ছে বিভূতি বিশ্বাস, বিষ্টু বাবাকে জিপে তুলে ড্রাইভারকে বলে—সাবধানে যাবি।

সাবধানে অবশ্য যেতেই হয়, এই পথে। পথ এ নয়।

দুদিকে জলা আর মাঝে মাটি তুলে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সেই বাঁধ দিয়ে পায়ে চলা পথ, সেটাকেই একটু চেষ্টা করে জিপ চলার মত করা হয়েছে।

কাটা মাটির পথ, যেখানে সেখানে তার প্রয়োজনমত বেঁকেছে, জিপ ঘোরানোর জায়গাও নেই, ঘুরতে গেলে একটা চাকা শূন্যেই ঘুরে যায়।

বিভূতি বিশ্বাস বলে—ই বদ্ধ খাবার আটকে জলে পড়বো নাকি রে ? এতে চড়ে মানুষ' এ্যাই।

ড্রাইভার বিশু ঘোষ এর বয়স হয়েছে।

ইদানীং বিষ্টুবাবুরা ভেড়িরমাছ কাঁটায় পাঠাবার জন্য, আলাঘরে মালপত্র আনার জন্য জিপ খান কিনেছে, আর এছাড়া দুটো বাড়িতে আছে।

কলকাতাকে প্রায় যেতে হয়।

বিষ্টুবাবু, কেষ্টবাবু আর ছোট ভাই এর নাম ভোলানাথ। এদেরও

নিজেদের প্রয়োজন আছে গাড়ির। কারণ ভেড়ির ব্যবসা ছাড়াও কি সব কারখানাও করেছে। আর মেজভাই কেষ্টবাবু তো রীতিমত ইনজিনিয়ারিং পাশ করে সেইসব কারখানা দেখে ভাল করে।

গাড়িটা হেলতে দুলতে কোন রকমে আসছে।

বিভূতি বিশ্বাস গজগজ করে—

সাহেব হয়েছেন। গাড়ি চাই গণ্ডা দেড়েক গাড়ি কিনে তোমার মালিকরা কত টাকা জলে দিয়েছে জানিও? আর একখান ভেড়ি হতো এই পয়সায়।

বিশু চুপ করে থাকে।

বিভূতি বিশ্বাসকে সারা এলাকার লোক এখন খাতির করে। লোকটা নিজের পরিশ্রমে যেন ছোটোখাটো একটা সাম্রাজ্য গড়েছে। আর মানুষকে বেশী পয়সা অর্জন করতে গেলে, ততবেশী অপবাদ সইতে হয়। কারণ অন্যের হাত থেকে ভালমন্দ নানা উপায়ে পয়সা ছিনিয়ে না নিলে সেটা কারোও হাতে আসে না।

কিন্তু বিভূতি বিশ্বাসের সেই অপবাদ নেই।

বরং এই এলাকায় তার গ্রাম, আশপাশের গ্রামের বহু লোককে সে তার বিভিন্ন ভেড়িতে কাজ দিয়েছে, তাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লোকের বিপদে আপদে দেখে, গ্রামে ছোটোখাটো একটা ডাক্তারখানাও খুলেছে, সেখানে এদিকের রোগীদের চিকিৎসা করা হয়, ওষুধপত্রও দেওয়া হয়। তার জন্য ওই মাছের পাইকেরী বাজার, নিজেদের হাট থেকে দৈনিক একটা টাকা আসে। বিভূতি বিশ্বাস এখন প্রায় সরকারের সর্ব দায়ই মিটিয়ে এনেছে।

সামান্য সরকারের কাছ থেকে আজ বিভূতি বিশ্বাস কোথায় উঠেছে, কিন্তু লোকটা এতটুকুও বদলায় নি।

হঠাৎ মাঝপথে গাড়ি থেকে নেমে বলে—তুই যা বিশুশ্লা তেলের গন্ধে গা গুলোয় বাবু। আমি এটুকু পথ হেঁটে চলে যাবো।

দূরে ওর বিশাল বাড়িটা দেখা যায়, বিরাট এলাকা নিয়ে বাগান,

পুকুর ওদিকে মাথা তুলেছে বড় একটা মন্দির, তার লগোয়া তিনমহলা বাড়ি। বারান্দায় সুদৃশ্য গ্রিল দেওয়া, মেঝেতে রঙীন মোজাইক করা গ্যারেজে খান তিনচার গাড়ি—ওদিকে নিজেদের বড় বড় পাম্পসেট, ওতে ভেড়ির জল ঢোকানো হয়, এছাড়া ওই দূর মফঃস্বলের গ্রামে নিজেদের জেনারেটর বসিয়ে বিজলির আলো জ্বলে বাথরুমে গীজার ও চলে, আর সন্ধ্যার পর ঘরে বসে টি ভি-তে সিনেমাও দেখা যায়।

বিভূতি বিশ্বাস বহু আগে সেবার কলকাতায় মালিকদের বাড়ি গিয়ে সিনেমা দেখেছিল, কি সব ঠাকুর দেবতার ছবি। এখন বাড়িতেই এসব দেখে ওরা।

বিভূতি বিশ্বাস জীবনেও এসব কথা ভাবেনি।

কোনমতে সাবেকি বাড়িতেই ছিল সে, অল্পেই সে ছিল খুশী। বিষ্টু ভেড়ির কাজে পুরোপুরি নেমে যায়, গাঁয়ের স্কুলে ক্লাশ সিক্স অবধি পড়ে ছিল, তখন বিভূতির লোকের দরকার।

বিষ্টুও ব্যবসাতে নেমেছিল, তখন মেজছেলে কেষ্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছে। পড়াশোনাতে সে ভালোই, স্কুলে ফাষ্ট হয়।

বিষ্টু বলে—ওকেই পড়াও বাবা। ওর বুদ্ধি আছে।

কামিনী বলে—তোর তো অনেক বুদ্ধিরে!

বিষ্টু বলে—কিন্তু বাবার ব্যবসাতো দেখতে হবে মা।

তখন বিভূতি বিশ্বাস এর ঘরে মালক্ষ্মীর আনাগোনা সুরু হয়েছে। মাছের দরও চড়-চড়িয়ে বাড়ছে। বাজারে পড়তে পাচ্ছে না মাল। বিভূতি তখন দু'নম্বর ভেড়ি কিনেছে। কাজের চাপও বেড়েছে।

বিভূতি বলে—এবার কিষ্টকেও কাজে লাগা বিষ্টু। তুই একা কত পারবি? বিষ্টু দিনরাত পরিশ্রম করে নোতুন ভেড়ি চালু করেছে।

বিরাট ভেড়িকে জলশূণ্য করে রোদে শুকিয়ে মাটি কাটিয়ে তারপর চূণ ছড়াতে হচ্ছে, চূণের পর ছড়ানো হবে মহুয়ার খোল। ট্রাকবন্দী মহুয়ার খোল, চূণ আনা হচ্ছে, সার চাই। মহুয়ার খোল মাছের খাদ্য। তাই ছড়াতে হয় ভেড়িতে।

এবার পাম্প বসিয়ে খাল এর মুখ কেটে ওই বিস্তীর্ণ এলাকার বাতিল ময়লা জল ঢুকিয়ে ভর্তি করতে হবে ওই জলাধার।

তারপর সাতদিন ধরে ওই জল থিতোবে। তারপর ডিমপোনা ছাড়তে হবে।

তারও প্রস্তুতি আছে। অন্য পুকুরে ডিম ফোটানো হয়। বিভূতি বিশ্বাসের এসব ব্যাপারে নিজস্ব কিছু ফর্মূলা আছে। ডিম আনতে হবে লালগোলা, কোলাঘাট এর দিক থেকে, আর ওরা মৌসুমের ডিমও পছন্দ করে বেশী। ওতে সেরা মাছ হয়, বাজে ডিম হলে অন্য জাতের বাজে মাছই হবে।

নানা কাজ বিষ্টুর। দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে।

বিভূতি তখন আড়তও খুলেছে। বিষ্টু বলে—না বাবা।

কেষ্ট পড়াশোনায় ফাস্ট হচ্ছে। ওকে সহরে রেখে পড়াও। ও ডাক্তার—ইন্‌জিনিয়ার হবে।

বিভূতি বিশ্বাস চমকে ওঠে—সে কিরে? কিষ্ট হবে ইন্‌জিনিয়ার?

কামিনীও পয়সার মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে এবার অন্য কথা ভাবছে। এতদিন এসব কথা ভাবার উপায়ও ছিল না। তাদের বংশে কেউ কোনদিন এসব কথা ভাবেনি।

ওরা মুখ বুজে পরিশ্রম করে অপরের ঘরে তুলে দিয়েছে সবকিছু। আজ দিন বদলেছে।

বলে কামিনী—কেন লেখাপড়ায় ভালো হলে ওসব হতে পারবে নিশ্চয়। আর খরচ যোগাবো আমি। তুমি যদি না দাও।

বিভূতি বিশ্বাস পারিবারিক ভোটে সেদিন হেরে গেল। কিষ্টকে কলকাতায় কোন নামী স্কুলে ভর্তি করেছিল বিভূতি বিশ্বাস। হেডমাষ্টার শিবেন বাবুই ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারপর কেষ্ট ধাপে ধাপে উঠেছে।

ক্রমশ দেখেছে বিভূতি কেষ্ট যেন বদলে গেছে। তার পোষাক-আশাকে এসেছে পরিবর্তন। দামী প্যাণ্ট, সার্ট, জুতো পরে। ছুটিতে

বাড়িতে এসে বলে—

—মাটির বাড়িতে থাকা যায়? আলো হাওয়া ঢোকে না।

বিষ্টুর দু'নম্বর ভেড়িও তখন রম-রমা চলছে।

আর এখন ছোট ভাই ভোলাও বড় হয়ে উঠছে।

বিভূতি বিশ্বাস মনে মনে তার সাবেকী বুদ্ধি দিয়ে হিসাব করে রেখেছে তিন ছেলের জন্য তিনটে ভেড়ি করে দেবে ওদের দিন কেটে যাবে। ওই থেকেই ভালো ভাবেই।

কিন্তু কেষ্টার ব্যাপারটা যেন আলাদা।

ভেড়ির দিকে যেতে চায় না। বলে—জল-কাদা ভেঙ্গে ওদিকে কে যাবে? আর বাপু মাটির ঘরটর ভেঙ্গে পাকাবাড়িই করো।—এ বাড়িতে কুলোচ্ছে না। লোকজন আসছে ছেলেরাও বড় হচ্ছে।

বাধ্য হয়ে বিভূতি বিশ্বাস পুকুর সমেত পঁচিশ বিঘে জলা, বাশবন কিনে সেখানে নোতুন বাড়ি, বাগান এসবের পত্তন করে।

কেষ্ট তখন পাশ করে ইন্‌জিনিয়ারি পড়েছে যাদবপুরে।

কামিনীর এ যেন বিশেষ গর্ব।

সারা গ্রামের মধ্যে তার ছেলে একটি রত্ন। গ্রামের সকলেই বলে বিশ্বাস মশাই এর ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী একত্রে বাঁধা পড়েছেন।

ওদিকে নোতুন বাড়িতে উঠে এসেছে তারা।

কামিনীর বহুদিনের সাধ মায়ের মন্দির একটা বানাবে। সেও রোজ কিছু কিছু করে পয়সা জমিয়েছে। আর বিভূতি বিশ্বাসের দিন তখন চলতি। তিন নম্বর ভেড়িও চালু হয়েছে। কেষ্ট ইন্‌জিনিয়ারিং এর ফাইনাল পরীক্ষা দিতে চলেছে।

সেবার মায়ের কথায় কেষ্ট বলে—তোমার মন্দির আমিই করে দেবো মা।

কেষ্ট নিজেই সেদিন নক্সাটা করে মাকে বুঝিয়ে দেয়। কামিনী দেখছে ছবিটা, বিভূতি বিশ্বাস বলে—ওসব কি রে?

বিষ্টু বরাবরই কেষ্টর সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করে। তাদের ভাইদের

তুলনায় কেষ্ট অনেক বড় হবে ছোট ভাই ভোলানাথ বলে—দাদা গম্বুজ বানিয়েছে মা।

কেষ্ট ধমকে ওঠে—থামবি তুই? আকাট কোথাকার। এক ক্লাশে তো দু'বছর গড়ান দিচ্ছিস। এসবের কি বুঝবি?

ভোলানাথ একটু গোঁয়ার গোছের। দাদার মন্তব্যে বলে সে

—পাকা-পোক্ত হচ্ছি বুঝলি।

থামায় ওদের বিষ্টু, কামিনী বলে—ভালো দেখে মন্দির করতে হবে বাবা। টাকা আমি দেবো।

কেষ্ট প্রথমেই হাত পাকাবার সুযোগটা ছাড়ে না।

সে মন্দির তৈরীর কাজে হাত দেয়।

বিভূতি বিশ্বাস এর একটা বস্তু আছে, সেটা হচ্ছে অসীম ধৈর্য্য। বিভূতি টাকা যুগিয়েছে আর কেষ্ট মন্দিরের পিছনে তার বুদ্ধি খরচ করে সুন্দর মন্দির বানিয়ে দেয়।

কামিনী বলে সুন্দর হয়েছে, বাবা!

মেজেতে মোজাইক করা দেওয়ালে প্যাণ্টাইল এর রঙ্গীন টালিসেট করেছে, সামনে নাটমণ্ডপ, সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর হয়েছে মন্দিরটা।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সারা গ্রাম, আশপাশের গ্রামের লোকদের ভূরিভোজের ব্যবস্থাও ছিল। কেষ্ট ইন্‌জিনীয়ারিং পাশ করেছে, এই বংশের বুকে যেন শুধু অর্থ নয়, সম্মানও নোতুন প্রতিষ্ঠা এনেছে কেষ্ট।

বিষ্টুর বুকটা যেন জয়ের গর্বে ফুলে উঠেছে।

তার ভাই আজ মানুষ হয়েছে, কলকাতার কোন সরকারী কাজে বহাল হয়েছে। এ দিকের নদী, বাঁধ—সাঁকো, ব্রিজ এসব তৈরীর কাজেও ঘুরতে হয় তাকে।

ভোলানাথ অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতের। বাবা-দাদারা কাজে ব্যস্ত থাকে। ভোলানাথ বড় হতে দেখেছে এ বাড়ির হালটা।

তাকে শাসন বিশেষ কেউ করে না।

স্কুলে দেখেছে মাস্টার মশাইরা তাকে কান মলেও না, পিঠে বেতও

ভাঙ্গে না। তবে ভোলানাথ স্কুলে দুষ্টুমিও বিশেষ করে না।

তার দুষ্টুমির ধাতপাত আলাদা। পয়সাও কিছু পায় ভোলানাথ মায়ের কাছ থেকে। এছাড়া হাটে বাজারে শম্ভুর মিষ্টির দোকানে তার জন্য মিষ্টির রোজ করা আছে।

ভোলানাথ এর মধ্যে স্কুলে বেশ কিছু ছেলেকে নিয়ে একটা দলই করছে, নিজে সেই দলের মধ্যমণি। নিজের পয়সায় ছেলেদের খাওয়ায়।

দরকার হলে সাহায্যও করে তাদের—আপদে-বিপদে।

গোবিন্দের মায়ের খুব অসুখ গোবিন্দের বাবা ঘরামীর কাজ করে। শশী ডাক্তার বলে—ওষুধের দাম নিয়ে আয়, আর দু টাকা ভিজিট দাও।

—তবে যাবো। বিনি পয়সায় চিকিৎসা হয় না, ও মরবে।

কাঁদছে গোবিন্দ।

ভোলানাথ স্কুলে যাচ্ছিল, শশী ডাক্তারের কথা শুনে এগিয়ে যায় ভোলানাথ। বলে সে কাকে মারছো ডাক্তার। তুমি যাকে দেখবে সেই মরবে। শশী ডাক্তার ধমকে ওঠে—"যা তা বলবি না ভোলা!"

মুরোদ থাকে ভালো ডাক্তার দেখাগে—খুব তো পয়সা বাপের।

ভোলানাথ গর্জে ওঠে—বাপ তুলে কথা বলবে না। ওর চিকিৎসা হবেই। আয়, গোবিন্দ।

ভোলানাথকে তাদের গদীর সরকার বাবুও সমীহ করে।

ফর্মচারীরাও খুদে মনিবকে অন্য চোখে দেখে। গতবার পূজার সময় ভোলানাথ জেদ ধরে।

—ভেড়ি আড়তের সব কর্মচারীকে নোতুন ধুতি জামা দিতে হবে, না হলে আমিও নোতুন জামা প্যান্ট পরবো না।

ফলে বিভূতি বিশ্বাসের বেশ কিছু টাকা খসেছিল। কর্মচারীরা চেনে খুদে মনিবকে। আজ তাকে গদিতে আসতে দেখে চাইল।

ভোলানাথ বলে—সরকার মশাই, এখুনি গবার মাকে কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে হবে। জিপটা নিয়ে চলো।

অবাক হয় সরকার—কি ব্যাপার ?

ভোলানাথ বলে ওসব শুনবে পরে। ক্যাস থেকে দুশো টাকা দাও। আর যেভাবে হোক হাসপাতালে ভর্তি করে সারিয়ে তুলতে হবে। শশী ডাক্তার বলে কিনা গবার মা মরবে। দেখাচ্ছি ওকে। কই চলো—

সরকার জানে যেতেই হবে তাকে। তাই উঠলো। তবু বলে —কত্তা মশাইকে বলতে হবে না ? ভোলানাথ বলে—সে আমি বুঝবো। চলো তো—

ভোলানাথ এর স্বভাব এমনিই।

পড়াশোনার চেয়ে ওই সব দিকেই তার বেশী নজর।

কামিনী বলে তুই লেখাপড়া করবি না ওই সব করবি ?

ভোলানাথ তখন বাইরের ঘরের ফুটবল কাম্প করতে ব্যস্ত। ইদানীং ভোলনাথ নিজের খর্চায় কলকাতা থেকে দলের জন্য প্যান্ট, জারসী, মায় বুট অবধি কিনে এনে স্কুলের পাশে দত্তদের মাঠে গোলপোষ্ট পুঁতে ফুটবল ক্লাব, লাইব্রেরী, নাইট স্কুলের পত্তন করেছে।

মায়ের কথায় ভোলানাথ বলে। —কি আবার করলাম ?

কামিনী বলে—শশী ডাক্তারকে কি বলেছিস ?

ভোলনাথ বলে—ডাক্তার ওটা চামার। বলে কিনা গবুর মা মরবে। তাই ওকে কলকাতায় নিয়ে গেছি চিকিৎসা করাতে।

ভোলানাথ এর সত্যি কথা বলতে ভয় নেই। বলে সে,

—বাবাকে নালিশ করেছে বুঝি ?

মা জানে ছেলেকে। আবার কি করবে কে জানে। তাই বলে।

—না, না।

অবশ্য বিষ্টু আড়ালে ভাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

বিষ্টু ব্যবসাপত্র নিয়েই থাকে। ওর ছোটভাইকে সেও ভালোবাসে।

বিষ্টু বলে—এসব করিস কেন ?

বিষ্টুর এখন বিয়ে থা হয়েছে।

বিভূতি বিশ্বাস এর সংসার এখন সুখে শান্তিতে ভরে উঠেছে। বিভূতি বিশ্বাস ছেলের বিয়ে দেবে শুনে কলকাতা থেকে ওদের জাত এর অনেক ব্যক্তিই গাড়ি নিয়ে এখানে এসে হাজির হয়।

কলকাতার বনেদী ব্যবসাদার এরা।

গিন্নীরাও এসেছে। বেশ মোটা সোটা আয়েষী দেহ, পরণে মানাক না মানাক দামী সাচ্চাজারির কাজ করা কড়িয়াল, কেউ কাঞ্জিভরম পরে সর্বাঙ্গে গহনা চাপিয়ে এসে হাজির হয়।

তখনও বিশ্বাস মশাই এর বাড়ির কাজ শেষ হয় নি। তবে বাড়ির আয়তন দেখে তারা আন্দাজ করে নেয় প্রাসাদখানা কেমন হবে। কর্তারা জানে বিশ্বাস মশাই এর ব্যবসার খবর। তাই তারা দরটাকে কেউ দু লাখ, কেউ তিন লাখই দেবে।

কামিনী ছেলেবেলা থেকেই গ্রামে মানুষ। ইদানীং গাড়িতে করে দু' একবার কলকাতায় কালিঘাট, না হয় দক্ষিণেশ্বরে গেছে, গঙ্গাস্নান করে এসেছে। কলকাতা সম্বন্ধে তার মনে একটা ভয়ই রয়েছে।

ওই মোটা সোটা গহনা মোড়া গিন্নীদের দেখে ঘাবড়ে গেছে সে। তার এতসব কিছু নেই, প্রয়োজনও বোধ করে নি। একজন বলেন। কলকাতায় একখানা বাড়িও দেব। মেয়ে আমার পাড়া গাঁয়ে থাকতে পারবে না। গাড়ি থাকবে, বিষ্টু এখানে ব্যবসাপত্র দেখে রাতে সহরে ফিরে যাবে। ঘণ্টা খানেকের পথ তো।

ওরা চলে যেতে কামিনী বলে স্বামীকে,—ওসব কলকাতার সহুরে মেয়ে আনবো না বাপু।

ভোলানাথ বলে—তুমিও সহুরে হও মা।

—না বাবা।

কামিনী ঘোষণা করে। —পাড়াগাঁয়ের গরীবের ঘর থেকেই মেয়ে আনবো, দেখতে সুন্দরী হলেই চলবে। মা লক্ষ্মী অনেক দিয়েছেন,

ছেলে বেচে টাকা আনতে পারবো না বাপু। বিনি পয়সাতে বৌ আনবো।

বিশ্বাস মশাইও তাই চায়।

বলে সে—তাই ভালো বিষ্টুর মা। আমিও এদিকেই মেয়ে খুঁজছি।"

বিষ্টুর জন্য ওরা লক্ষ্মীকেই ঘরে এনেছিল।

ঘটকপুকুরের কাছে কোন গ্রামের মেয়ে; বাবা গরীব—স্কুল মাষ্টার, লক্ষ্মী দেখতে শুনতেও ভালো। সুশ্রী। আর সেই রূপে কোন কৃত্রিম শ্যাম পালিশের মেকি ঝলক নেই। শান্তশিষ্ট লক্ষ্মীও আশা করেনি তার এমনি শ্বশুর বাড়ি জুটে যাবে।

শিবু মাষ্টার মশাই বিভূতিবাবুকে চেনে। তার স্কুলের জন্যও সাহায্য দিয়ে গেছে। আজ সেখানে এসেছে কুটম্ব হয়ে।

শিবু মাষ্টার প্রথমে বিভূতি বিশ্বাসের প্রভাবে হতচকিত হয়ে বলে—

বলছেন কি বিশ্বাস মশাই? আমার মেয়ের কি এতবড় ভাগ্যি হবে? আর আমি গরীব, আপনার মর্যাদা রাখার সঙ্গতি কোথায়?

হাসে বিশ্বাস মশাই।

বলে—এসব কি বলছো মাষ্টার? আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি, তোমার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবো বৌমা করে, এতে খর্চা কেন করতে হবে তোমায়? একজোড়া লালপাড় শাড়ি, হরিতকী আর মাকে একজোড়া শাঁখা, একখান সিঁন্দুর এটুকু তো পারবে হে। বাস। এই চাই বাপু।

অবাক হয় শিবু মাষ্টার।

ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিল বিভূতি বিশ্বাস বিষ্টুর। ভোলানাথও নোতুন বৌদিকে দেখে খুশী। বলে সে

—ভাল। বৌদি ভালোই হয়েছে মা।

খুশি হয়নি কেষ্ট। এখন সে সদ্য পাশ করে ইন্‌জিনিয়ার হয়েছে।

কলকাতায় বিশেষ মহলে তার মেলা মেশা। বিয়েতে গাড়িতে করে কলকাতা থেকে তার কিছু বন্ধু বান্ধবও এসেছে।

তারাও বরযাত্রী গেছে।

কেষ্ট ফিরে এসে মাকে বলে—কোন অজ গেইয়া মেয়েকে ঘরে আনলে মা। লোক গুলোও তেমনি। এটিকেট জানে না। ম্যানারস্ জানে না। একেবারে অসভ্য, হরিবল্।

ইদানীং কেষ্ট এই সব পরিবেশকে যেন মেনে নিতে পারছে না।

কেষ্টর কথায় ভোলানাথ বলে, অসভ্যতা কি করেছে তারা? বেশ তো আয়োজন করেছে ওই গাঁয়ে।

কেষ্ট ধমকে ওঠে—তুই থাম তো, তুই নিজে একটা অজ গেঁইয়া, সভ্যতার কি বুঝিস?

ভোলানাথ চাইল কেষ্টোর দিকে।

কামিনী চেনে তার ছোট ছেলেকে, তাই বলে, থামতো বাপু। বাড়িতে এখন কাজ। দেখাশোনা কর। আর কেষ্টো, ঠাকুরকে বল তোর বন্ধুদের জন্য মাখন, পাউরুটি, কলা, সন্দেশ এসব যা লাগে যেন ব্যবস্থা করে দেয়। ভোলা, তুই ছাখ বাবা, বর-কনে আসার সময় হল। গাড়িগুলো যেন সব যায়। কনেযাত্রীরাও আসবে।

ভোলানাথ আপাততঃ সরে গেল।

বৌদিকে ভোলানাথের ভালো লাগে। সহরের শান পালিশ নেই। সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে। আর দেখেছে ভোলানাথ বৌদির প্রাণে মায়া দয়া আছে।

এ বাড়িতে নোতুন বউ হয়ে এসে লক্ষ্মী ক'দিনেই এ বাড়ির হাল চাল বুঝে নিয়েছে। শান্ত নম্র মেয়েটি কামিনীর হাত থেকে সংসারের কাজ কর্ম বুঝে নিয়েছে, বাড়িতে ঠাকুর কাজের লোক সবই রয়েছে, লক্ষ্মীই নিজের হাতে সকালে ভাঁড়ার বের করে দেয়। জলখাবারের ব্যবস্থাও করে লক্ষ্মীই।

বলে কামিনীকে—আপনি ঠাকুর ঘরের কাজই দেখুন মা, এদিকটা

আমি সামলাচ্ছি।

কামিনী বলে—তুমি পারবে মা?

লক্ষ্মী বলে—হ্যাঁ মা। বাড়িতে তো এসব করেছি।

ভোলানাথ সকালে হঠাৎ বৌদিকে চা নিয়ে ঢুকতে দেখে অবাক হয়।

কি ব্যাপার বৌদি?

দু' একটা কুকুর ভোলানাথের আশ্রিত। অবশ্য জাতের কুকুর তারা নয়, নির্ভেজাল নেড়ি কুত্তা। লক্ষ্মী তাদের এদিক ওদিকে ঘুরতে দেখে বলে?

—ওদের জন্য খাবার কিছু আনি?

ভোলানাথ একটু অবাক হয়। লক্ষ্মী কিছু রুটি এনে ওদের খেতে দিতে থাকে, কুকুরগুলোও জুটেছে ওর চারিপাশে।

ভোলানাথ ক্রমশঃ সাহস পেয়ে বলে—

বাবা ওগুলোকে দেখতে পারে না বৌদি, মেজদা তো বলে বাড়িতে যতো নোংরা জোটাই। ওদের নাকি গুলি করে মারবে।

লক্ষ্মী আশ্বাস দেয়—

—ইস্ গুলি করলেই হলো? আমি মেজসাহেবকে বলে দেবো। লক্ষ্মী বলে—ফুটবল খেলা চলছে ক্যামন? তুমি নাকি পড়াশোনা না করে গ্রামে হৈ চৈ করো।

ভোলানাথ বিছানায় বসে বলে,—এসব খবর তুমি পেলে কোথা থেকে?

লক্ষ্মী বলে পাই গো মশায়। তা বাপু পড়াশোনাটা করো। পাশ করতেই হবে কিন্তু।

ভোলা বলে—আরে বাব্বা, মাষ্টারের মেয়ে দেখি মাষ্টারি সুরু করলে?

হাসে লক্ষ্মী। কেন অন্যায় কিছু বলেছি?

ভোলা বলে—না। তা বলোনি। নায্য কথাই বলেছো।

—হুঁ। যাও, হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসো। লক্ষ্মী বলে।

ভোলানাথ এতদিন দেখেছে এ বাড়িতে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। বাবা এখনও এই বয়সে ভোরে উঠেই আড়তে চলে যায়, বড়দাও ভোরেই জিপ নিয়ে ভেড়িতে চলে যায়। ফেরে সেই দুপুরে।

আর মেজদা এ বাড়িতে বড় একটা থাকে না। ইদানীং কলকাতায় একটা বাড়ি কেনা হয়েছে, সেখানেই থাকে। শনিবার রবিবার আসে বাড়িতে। সেও থাকে নিজের সাহেবী মেজাজ নিয়ে। কেষ্ট এখন যেন পাক্কা সাহেবই হয়েছে।

ফলে ভোলানাথ বাড়িতে নিঃসঙ্গ একা।

তার দিকে চাইবার কেউ নেই। সে থাকে বাইরের ছেলেদের নিয়ে। আর বাড়িতে সজ্জী ও কুকুরের পাল।

ভোলানাথ হঠাৎ বাড়িতে বড় বৌদিকে সঙ্গী পেয়েছে, মনে হয় তার এখন একজন অন্তত তার কথা ভাবে।

লক্ষ্মী বাড়ির কাজের লোকদের দিয়ে ওর ক্লাবের জারসী কাচিয়ে ইস্ত্রি করায়, হাফটাইমের সময় লোক পাঠায়। একদিন সন্ধ্যায় খেলার পর বাড়ির বাইরে বৈঠকখানা বাড়িতে ভোলার দলবল ফুটবল খেলা জিতে শিল্ড এনেছে।

লক্ষ্মীই বলে—মা, দেখে যাও কতবড় শিল্ড পেয়েছে ওরা।

বিভূতি বিশ্বাস ঘরে বসে জমা খরচের হিসাব দেখছিল। এখন নোতুন বৌমার জন্য সন্ধ্যার পর বেরুনো যায় না। বলে—আবার কোথায় যাবেন বাবা?

বিশ্বাস মশাই এর মধ্যে বৌমার হাতে সাজা বিষ্টুপুরী তামাকের ভক্ত হয়ে উঠেছে। বৌমার হাত থেকে হুকো কলকেটা নিয়ে একটা সুখটান দিয়ে বলে—আড়তের হিসাবপত্র দেখতে হবে। যাই, ঘুরে আসি।

লক্ষ্মী ক'দিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এই ব্যবস্থা করেছে।

বলে সে—সরকার কাকাকে বলেছি, বাড়িতেই হিসাবপত্র আনবে চোখে কম দেখেন সন্ধ্যার পর আর বের হবেন না।

কামিনী স্বামীকে বলে পারে নি।

আজ ছোট্ট ওই মেয়েটিকে সেই কথা বলতে দেখে কামিনী শোনায়।—ঠিক বলেছিস মা।

বিভূতি বিশ্বাস চুপ করে যায়।

এখন বাড়িতেই হিসাবপত্র দেখে। লক্ষ্মীকে ওই শিল্ড এর কথা বলতে দেখে বলে—ওটা ওই সব নিয়েই থাকবে? পড়াশোনা করবে না, ব্যবসাপত্র দেখবে না, কি হবে ওর?

কামিনীও ভাবছে সেই কথাটা।

বড় ছেলে এখন ব্যবসা ভালোই চালাচ্ছে, মেজ ছেলেও কৃতি। আর সে বাড়ির ব্যাপারে বিশেষ থাকে না। ভরসা ছিল ভোলানাথের উপর। সে তার নিজের ব্যবসাটাকে ভাল করবে।

কিন্তু তার এদিকে মন নেই। সরকার মশাই এর খাতাটা দেখে বলে বিভূতি—আজ একশো টাকা ভোলা নিয়েছে গদি থেকে? কেন দাও হে? মাঝে মাঝেই ভোলানাথ আড়তে গিয়ে তোমাকে ধমকে দু'একশো টাকা নেয়।

সরকার বলে—আজ্ঞে জোর করে নেবে?

—জোর। বিভূতি বিশ্বাস গর্জে ওঠে।

—ডাক ওটাকে। আজ দেখছি ওকে।

কামিনীও স্বামীকে ভয় করে। জানে ও চটে গেলে এক্ষুনি অনর্থ বাঁধবে। ভোলা বাইরেই রয়েছে। শিল্ড জয়ের আনন্দে মশগুল, এক্ষুনি কি কাণ্ড ঘটবে কে জানে।

কামিনী বলে—যা বলার ওকে পরে বলো।

বিভূতি বিশ্বাস ধমকে ওঠে।

—তুমি থামো তো। আদর দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছো। ডাক ওকে।

লক্ষ্মী ব্যাপারটা বুঝে বলে। —আজ শিল্ড জিতেছে, খেলাধুলো করে, অন্যায় তো কিছু করে না ও বাবা। আর এই বাড়ির ছেলে

—গ্রামের জন্য কিছু করবে না? অন্যায় তো কিছু করেনি ও।

বিভূতি বিশ্বাস চাইল বৌমার দিকে।

লক্ষ্মী প্রতিমার মত শান্ত মেয়েটি কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা নির্দেশই ফুটে উঠেছে।

বিভূতি বিশ্বাস বলে—তুমিও বলছো মা?

লক্ষ্মী বলে—ওর ক্লাবের জন্য কিছু টাকা পয়সার বরাদ্দ করে দেন, নাহলে ও পাবে কোথায় বাবা? ভালো কাজই করে ও।

বিভূতি বিশ্বাস বলে। —ঠিক আছে। দাও সরকার, ছোট বাবুর ক্লাবে—মানে ওই ঈশ্বর বৃত্তির খাতে থেকে মাসে শ' দুয়েক টাকা বরাদ্দ রেখো বাপু।

তবে বৌমা ওই হারামজাদাকে বলো, পাশটা করুক।

লক্ষ্মী বলে—ও পড়ছে বাবা। দেখবেন ঠিক পাশ করবেই।

তারপর বলে,—ওদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করেছি মা, খেলাধুলো করে এলো। বিভূতি বিশ্বাস বলে—প্রসাদ তাহলে এদিকেও পাঠিও।

সরকার মশাই বলে—মা আমাদের অন্নপূর্ণা।

ভোলানাথ এর আগে বন্ধুদের এনেছে বাইরের বাড়িতে। বাবা ওদের ভালো চোখে দেখে না, মাও এড়িয়ে যায়। ফলে ভোলানাথ ওদের তেমন ভাবে আপ্যায়ণ করতেও পারে না। মনে মনে রাগই হয় তার। ওর এ বাড়িতে যেন কোন দাবী নাই।

ও যেন এই বড় বাড়ির ফালতু একজন।

দেখেছে ভোলানাথ মেজদার বন্ধু বান্ধব আসে সহর থেকে তখন বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে যায়। মেজদার মহলই আলাদা। সেখানে মেজদা নিজের বাথরুম, ড্রইং রুম, বেড রুম করিয়েছে। টি-ভি ও এনেছে। বন্ধু বান্ধবরা এলে মুরগী কাটা হয়। ভেড়ির গোবর্দ্ধন দাশ আসে সাহেবদের খানা বানাতে।

কামিনী অবধি তটস্থ থাকে সে সময়।

বড়দার ব্যবসার বন্ধুদেরও আপ্যায়ণ করা হয় সেই ভাবেই।

আজ ভোলানাথ বৌদির মুখে তাদের কথাটা শুনে অবাক হয়। ওর বন্ধুরাও চীৎকার করে ওঠে। —বৌদি কি জয়!

লক্ষ্মীর ভালো লাগে এই ছেলেদের কলরব।

বলে সে—নাট্য-মন্দিরে বসে পড়ো হাত মুখ ধুয়ে।

লক্ষ্মী কাজের মেয়েটাকে নিয়ে আর মন্দিরের পূজারীকে নিয়ে গাছ কোমর করে পাতায় গরম লুচি, আলুর দম, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল পরিবেশন করছে।

ভোলানাথও রয়েছে। বৌদিই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলে তাকে রস-গোল্লা যা পাও আনো!

ভোলানাথ রসগোল্লাও এনেছে। বন্ধুদের পরিতৃপ্ত করে খাওয়ায় লক্ষ্মী।

কামিনীও এসেছে। দেখছে ওই সুন্দর পরিবেশটাকে। ভোলানাথও খুশী হয়েছে।

হঠাৎ গাড়ির শব্দে ওরা চাইল। কেষ্ট দু-চারজন বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছে। সে এইসব কাণ্ড দেখে দাঁড়ালো। সে যে খুশী হয় নি তা ওর মুখ চোখ দেখেই বোঝা যায়।

কামিনী বলে—শীল্ড জিতেছে, তাই বোমা ওদের খাওয়াচ্ছে।

কেষ্ট হুকুম দেয়। গোবরাকে খবর দিতে বলো মা, মুরগী গোটাকতক আনবে ভেড়ি থেকে। আমরা উপরে যাচ্ছি কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়ো কাউকে দিয়ে।

লক্ষ্মী জানে ওরা মদের বোতল খুলে বসবে ওদের মহলে। লক্ষ্মী যায় না তখন। চাকরদের দিয়েই ভাজাভুজি কিছু পাঠিয়ে দেয়। কামিনীও খবরটা জানে।

কিন্তু কিছু বলতে পারে না মুখে। শিক্ষিত ছেলের সব জুলুমই সহ্য করে নীরবে।

ভোলানাথও ব্যাপাটা জানে।

অবশ্য এ সব ব্যাপারে সে কোন কথাই বলে না।

ভোলানাথ তার বড়দাদা বিষ্টুকে বুঝতে পারে। ভেড়িতে খাটে, মাটির কাছাকাছি খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে থাকে। তার একটা অন্তর আছে। বড়দাকে তবু ভালোবাসে ভোলানাথ।

বিষ্টু চীৎকার করে কথা বলে, কথাগুলো কর্কশ। কিন্তু অন্তরে একটা মাধুর্য আছে।

কিন্তু কেষ্ট তার বিপরীতই।

ভোলানাথ চুপ করে দেখছে তার সাহেব মেজদা ও সঙ্গী সাথীদের। ওদের চোখে এদের খাওয়ার দৃশ্যটার প্রতিক্রিয়াও দেখেছে।

রাত্রি নেমেছে।

ভোলানাথ ঘরে বসে পড়ছে। বৌদিকে ঢুকতে দেখে চাইল।

লক্ষ্মী বলে—বাঃ, একেবারে গুড বয়!

—কেন? ভোলানাথ চাইল বৌদির দিকে।

ওদিকে মেজদার মহল থেকে ষ্টিরিওতে বিদেশী বাজনার বিকৃত সুর ওঠে। ওদের হৈ চৈ শোনা যায়।

সন্ধ্যার পর গ্রামে শুদ্ধতা নামে। ছোটগ্রাম।

মন্দিরে তখন জেনারেটারের আলো জ্বলে ওঠে। বিশ্বাসও এ সময় মন্দিরে যায়, বিষ্টুও কাজ সেরে মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে আরতির পর।

নাম গানের সুর ওঠে।

ক্রমশঃ সেই সুর ছাপিয়ে আজ শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে বিদেশী বাজনার উৎকট সুর।

ভোলারে লক্ষ্মী বলে—বাবাকে বলে তোমার ক্লাবের জন্যে মাসে গদি থেকে দেড়শো টাকার বরাদ্দ করেছি, গদিতে গিয়ে সরকার কাকাকে আর টাকার জন্য জুলুম করবে না।

—সত্যি! ভোলানাথ খুশী হয়।

বলে সে—সত্যি, একটা উপকার করলে বৌদি।

লক্ষ্মী বলে—এবার কিন্তু আমার একটা কাজ করতে হবে, করবে ?

ভোলানাথ বৌদিকে তার আপনজন বলে জেনেছে। আজ বন্ধুদের সামনে তার মুখ রেখেছে। ভোলানাথ বৌদির জন্য সব কাজই করতে রাজী।

বলে সে-বলো কি করতে হবে ? নিশ্চয়ই করবো।

লক্ষ্মী বলে—এবার পাশ তোমাকে করতে হবে। মন দিয়ে পড়া শোনা করবে। নাহলে বাবা মায়ের কাছে আমার মুখ থাকবে না।

অবাক হয় ভোলানাথ।

এভাবে তাকে কেউ কোনদিন অনুরোধ করে নি।

—বলে ভোলানাথ আমি পাশ করলে খুশী হবে ?

ঘাড় নাড়ে লক্ষ্মী। বলে তাইতো বলছি।

ভোলানাথ বলে—চেষ্টা করবো বৌদি।

—তুমি চেষ্টা করলেই পারবে।

লক্ষ্মীই নিজে বিশ্বাস মশাইকে বলে একজন মাষ্টারও ঠিক করেছে। ভোলানাথও বদলে গেছে।

কামিনী অবাক হয় ভোলানাথের সেই দুরন্তপনা কমে গেছে, এখন সে মন দিয়ে পড়াশোনা করে চলেছে।

মন্থ গতিতেই সংসারের চাকাটা ঘুরছে। বিভূতি বিশ্বাস হঠাৎ একটু যেন বাধা পায়। কামিনী কিছু দিন থেকেই ধরেছে—এবার কেষ্টা তো ঠাকুরের দয়ায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, ওর বিয়ে থা দেবার কথা ভাবো বাপু।

বিভূতি বিশ্বাস বরাবরই কেষ্টাকে যেন অন্য চোখে দেখে। কেষ্টো যেন এ বাড়ির ধাত পাতের বাইরে। বিশ্বাস মশাই এর বয়স হচ্ছে। এখন ব্যবসা পত্রের ঝামেলাও বেড়েছে। বিষ্টু আবার কি ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানা খুলেছে বেলেঘাটায়।

তাই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে বিষ্টুকে। খর্চাপত্রও হচ্ছে। তবে ব্যবসা চালু হলে নাকি সব টাকা উঠে আসবে। বিশ্বাস মশাই

ভেবেছিল, কেষ্ট চাকরী না করে ব্যবসা পত্র করবে। বিশ্বাস মশাইও সেদিন বলেছিল কেষ্টকে।

—পাশ করে এবার বাপু ব্যবসা পত্র ছাখ। চাকরিতে কি মাইনে পাবি পরের গোলামি করে?

কেষ্ট দেখছে এই ভেড়ির ব্যবসাকে। এ তার ভালো লাগে না।

এতে পয়সা আছে, কিন্তু পড়ে থাকতে হবে এই গ্রামে, কোন সোসাইটি নেই।

আর বিশেষ করে কেষ্ট এখন এক নোতুন নেশায় মেতেছে কলকাতার বাড়িতে থাকে—বালিগঞ্জের দিকে এক বন্ধুর বাড়িতে প্রায়ই যায়। তার বোন কবিতাকে ওর ভালো লাগে। রোজ সন্ধ্যায় সেখানে যেতে হয়।

কেষ্ট স্বপ্ন দেখছে এখন কবিতার স্বপ্ন।

কবিতাই বলে।—সরকারী ইন্‌জিনিয়ারের চাকরীটাই নাও, মান খাতির আছে, ওই ভেড়িতে পড়ে থেকে বুনো হয়ে যাবে।

কেষ্টই সেদিন বাবার কথায় বলে।

ওসব ভেড়ি ফেঁড়ি আমার দ্বারা চালানো যাবে না। ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে আমি নেই।

কেষ্ট বাবার সব ভাবনা চিন্তাকে পাত্তা দেয় না।

কেষ্টোর জবাবটা বিশ্বাস মশাইকে আহত করে।

বিশ্বাস মশাই রেগে ওঠে। বলে সে, —তোর বাপ্ করেছে। আর তোর দ্বারা হবে না।

কেষ্ট জানায়—আমার বাবা তো ইন্‌জিনিয়ার হয় নি।

বিশ্বাস মশাই বলে—আমি মুখ্যু, না? কি বলছিস তুই?

কামিনী দেখছে ওদের, বাপ বেটাতে বেধে যাবে বোধ হয়।

বলে কামিনী। —কাজ কি বাপু। ও যদি না করতে চায়, ব্যবসা জোর করে করাবে? যা মন চায় ওর করুক।

বিশ্বাস মশাই দেখছে ছেলেকে।

কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন কাজ করতে চায় না। তাই অপমানটা নীরবে হজম করে বলে —ঠিক আছে তাই করোগে।

তারপর থেকে বাবা ছেলের মধ্যে নীরব একটা ব্যবধানই গড়ে উঠেছে। দেখেছে বিশ্বাস মশাই কেষ্টোর বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে হৈ চৈ করে। মদও খায়। এসব বিভূতির ভালো লাগে না মোটেই।

অনেক কিছুই দেখেছে সে। তাই এই মদটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। তবু বিশ্বাস মশাই রাগটাকে সামলে রেখেছে।

আজ গিন্নীকে ওই কেষ্টোর বিয়ের কথা পাড়তে দেখে বলে—ওকি কথা রাখবে?

কামিনী ছেলেদের উপর ভরসা রাখে। বলে সে,

—কেন তোমার কথা রাখবে না? সোনারপুরের ওদিকে সীতানাথ বাবুর নাকি একটি ভালো মেয়ে আছে, আমিও দেখেছি। চেনা জানা ঘর, ভালো বংশ, ওই মেয়েটিকেই ছাখো। বিয়ে থা হলে কেষ্ট ঠিক হয়ে যাবে।

বিশ্বাস মশাইও ভাবছে কথাটা। তাই বলে সে—বলছো, দেখি।

খবরটা কেষ্টও পেয়ে যায়।

সেদিন বিশ্বাস মশাই সোনারপুর থেকে মেয়েটিকে দেখে ফিরছেন। পছন্দও হয়েছে।

কিন্তু কেষ্ট বলে—আমার বিয়ের জন্য ভেবো না বাবা। এখন বিয়ে করার সময় আমার নেই। বিশ্বাস মশাই অবাক হয়।

—কেন? কি এত কাজ তোর যে বিয়ে করবি না? টাইম নাই?

—কেষ্টোর জীবনে তখন কবিতা একটা বিশেষ 'ঠাই' করে নিয়েছে। দুজনে ছুটিতে বাইরেও গেছে। দীঘা, দার্জিলিং-এ ঘুরে এসেছে। কেষ্টোর কাছে কবিতাই যেন সব।

কবিতা সহরের চালু মেয়ে। রূপ যত না আছে তার চেয়েও বেশী আছে তার রূপের চটক। সেই চটকদারী রূপের ঝলকানিতে কেষ্টকে বিভ্রান্ত করেছে আলেয়ার মত। কবিতাও জানে কেষ্টদের বাড়ির

অবস্থা। বিরাট ব্যবসাদার ওর বাবা।

সুতরাং তার মত ছেলের উপর নিশ্চিন্তে ভর করা যেতে পারে এটা ভেবেই এগিয়েছে কবিতা।

কেষ্ট তাই বাবার কথায় বলে —আমার কথা আমি বল্লাম।

—তাহলে বিয়ে করবি না? বিশ্বাস মশাই এর সাবেকী সামন্ত তান্ত্রিক জেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

কেষ্ট বলে—আমার বিয়ে আমিই ঠিক করবো। ওই গেঁইয়া লেখা-পড়া না জানা মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না। আমার বিয়ে আমিই ঠিক করেছি।

এ বংশে এত বড় কথা কেউ বলেনি।

বিশ্বাস মশাই সম্মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠায় যেন আজ কঠিন একটা আঘাত হেনেছে কেষ্ট। চরম অপমানিত হয়েছে সে। ওই মেয়ের বাবার কাছেও কথা দিয়েই এসেছে।

কিন্তু কেষ্ট তারই সন্তান যাদের এতকাল ধরে বহু কষ্ট আর সংগ্রাম করে মানুষ করেছে তারাই যে এত বড় আঘাত দেবে তা ভাবেনি।

গর্জে ওটে বিশ্বাস মশাই। —এত বড় সাহস তোর?

কেষ্ট বলে—আমার নিজস্ব ব্যাপারে মাথা না গলালেই খুশী হবো। এ বাড়িতে আসবো না। ওরে বাধা দাও,

বিশ্বাস মশাই বলে। —এখানে কোন অধিকারও থাকবে না।

কেষ্ট ঠাণ্ডা স্বরে বলে—সেটা আমি বুঝে নোব।

বিশ্বাস মশাই এর চোখের সামনে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে কোথায় ঝড় উঠেছে। বিশ্বাস মশাই কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। জ্ঞান হারিয়ে যায় তার—কি রাগে, উত্তেজনায়।

চীৎকার করে ওঠে কামিনী।

—লক্ষ্মী—ভোলাও শুনেছিল ওঘর থেকে বাবা আর মেজদার চীৎকারটা, মায়ের চীৎকারে ওরা ছুটে যায়। বাবার দেহটা পড়ে আছে। বের হয়ে যাচ্ছে কেষ্ট।

লক্ষ্মী বলে —ছোট ঠাকুরপো ডাক্তারবাবুকে এখুনি নিয়ে এসো, আর তোমার বড়দাকে ভেড়ির আলাঘরে খবর পাঠাও, যেন এখুনিই চলে আসে।

বিভূতি বিশ্বাস সে যাত্রা কোন রকমে উঠলো।

বিষ্টু ক্রমশঃ দেখেছে বাবার শরীরটা কি যেন ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়েছে।

একাই তিনটে ভেড়ি, ব্যবসা-মাছের আড়ত কদিন সামলাতে হ'ল। কেষ্ট এদিকে আর আসেনি ক'দিন। লক্ষ্মীও শ্বশুর মশাইকে অক্লান্ত সেবায় কিছুটা সুস্থ করে তোলে।

বিশ্বাস মশাই সুস্থ হয়ে উঠে আবার সকালে আড়তে বের হতে সুরু করেছে। কামিনী বলে অনেক তো খাটলে জীবনভোর, আর কেন?

কথাটা বিশ্বাস মশাইও ভেবেছে।

সেই তরুণ বয়স থেকে খাটতে বের হয়েছিল অন্যের ভেড়িতে। রাতের তারাজ্বলা অন্ধকারে জাল টেনেছে কন্‌কনানি শীতে, তারপর হয়েছিল ভেড়ির সরকার। বহু ঝকমারির চাকরী। সেবার ডাকাত পড়েছিল ভেড়ির আঘররে।

বহু বেঁধে রাতের অন্ধকারে তারা এসেছিল বল্লম, সড়কি, দা রামদা এসব নিয়ে।

মাছ লুট করতে নেমেছিল, বিভূতি বিশ্বাসও বাধা দিয়েছিল, মুনিবের ভেড়িতে লুঠপাট হতে দেবে না সে। ওদের হঠিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নিজে চোট পেয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল কয়েক মাসের জন্য। এখনও হাটুটা বেদনা করে।

দীর্ঘ জীবনে বিভূতি বিশ্বাস এইখানে এসে পৌঁচেছে বহু পরিশ্রমে। আজ নিজের ছেলের কাছে ও এমনি নিষ্ঠুর ব্যবহার পেয়ে যেন ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু সবাই তেমন নয়। বিষ্টুকে দেখেছে—ওর উপর ভরসা করতে পারে সে। বৌমাও সত্যিই লক্ষ্মীই।

তবু ভাবনা হয় ওই ভোলানাথের জন্য। ছেলেটা এক বিচিত্র

ধরণের। সংসারের হিসাব বোঝে না।

বলে বিভূতি স্ত্রীর কথায়—

ভোলার জন্যই এখনও কাজ করতে হবে বিষ্টুর মা।

অবশ্য ভোলানাথের ওসব ভাবনা নেই। এদিকে সামনে তার পরীক্ষা। বিষ্টু বাবার অসুখের সময় বলে ভোলাকে—গদিতে গে বোস।

লক্ষ্মী বলে—সামনে পরীক্ষা, এখন ও যাবে কি করে? তুমি, সরকার মশায় যে ভাবে হোক চালিয়ে নাও।

বিষ্টু জানে ওই ভাইটির প্রতি লক্ষ্মীর বিশেষ স্নেহের ব্যাপারটা। কিষ্টু বলে—আমার দিকে তো চাইবার সময় নেই।

লক্ষ্মী স্বামীকে দেখছে। জানে সে বিষ্টুর পরিশ্রমের কথা। বলে লক্ষ্মী তোমারই বা সময় কোথায় বলো? দিনরাত কাজ আর কাজ।

বিষ্টু বলে—যাক্। তবু কথাটা স্বীকার করছো?

লক্ষ্মী স্বামীর কাছে এসে বলে,

—সবই দেখি, বুঝি। কিন্তু কি জানো বড়ছেলে, বড়বৌ হওয়ার ঠ্যালা অনেক। সব দায় দায়িত্বই ঘাড়ে এসে পড়ে।

বিষ্টু বলে—কিন্তু মেজবাবু তো এসব দেখল না।

লক্ষ্মী শোনায়—যে যার মত চলে। তুমি যদি ওই ভাবে চলতে, বাবার এতদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা এই সংসার আজ তছনছ হয়ে যেতো।

বিষ্টু হাসে। অনুযোগ করে সে।

—কিন্তু তোমার ভোলানাথকে বলো এবার সংসারের কাজ কর্মের দিকে মন দিক।

লক্ষ্মী বলে—পরীক্ষাটা হয়ে যাক। দেখবে সবই করবে।

হাসে বিষ্টু। মন্তব্য করে।—ওই আশা নিয়েই থাকো।

লক্ষ্মীর যেন জেদই চেপে গেছে, ভোলানাথ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, লক্ষ্মীর যেন বেশী ভাবনা। ঠাকুর মন্দিরের নির্মাল্য এনে দেয় ওর

মাথায়। বলে মা বাবাকে প্রণাম করে যাও ভোলা।

বিশ্বাস মশাই, কামিনীও অবাক হয় ভোলানাথকে প্রণাম করতে দেখে। ভোলানাথ ক্রমশঃ বদলাচ্ছে।

—কি ব্যাপার?

লক্ষ্মীই বলে—পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে ঠাকুরপো।

বিশ্বাস মশাই দেখছে দুরন্ত ছেলেটাকে। লক্ষ্মী তাড়া দেয়।

—চলো দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কেষ্ট সেই ঘটনার পর কলকাতায় এসেছে, বাবা মা দাদা বৌদি কেউ চায় না কেষ্ট এভাবে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করুক কলকাতায়।

ওদের চোখে কলকাতার সহুরে মেয়েদের সবাই যেন এক একটি অপদার্থ। কেষ্টোর চোখে কবিতা তা মোটেই নয়।

কবিতাও খবরটা শুনে বলে অভিমান ভরে।

—আমি যদি এতই তুচ্ছ, তাহলে তুমিও এসো না। আমাদের মেলামেশা বন্ধ করাই ভালো।

এ যেন কেষ্ট বিশ্বাসেরই অপমান, সারা বাড়ির সবাই চক্রান্ত করে কেষ্টকে অপমানিত করতে চায় কবিতার সামনে।

তাই কেষ্টোও এবার শক্ত হয়ে উঠেছে। জানে সে তারও বেশ কিছু সম্পত্তি আছে।

ওই তিনটে ভেড়ির একটা তারই, কেষ্ট নিজেও ভালো রোজগার করে। গাড়িও পেয়েছে অফিস থেকে, নিজেও কোয়াটারও পাবে। দরকার হলে সে তার কলকাতার বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটে আসবে, তবু কবিতাকে সে ছাড়তে পারবে না।

কবিতার ওই অভিমানের সুর শুনে কেষ্ট বলে—বাড়ির মত থাক আর না থাক কবিতা, আমাদের পথে কোন বাধাকে মানবো না। আমি নিজের মতেই চলবো।

কবিতা চাইল আশা ভরে।

এমনি কথাই শুনতে চেয়েছিল সে কেষ্টোর কাছে। খুশিই হয়েছে সে, কিন্তু সেই খুশিটা প্রকাশ করে না কবিতা।

তারও মনে হয় একবার সুযোগ পেলে সে ওই বিভূতি বিশ্বাস যে তাকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দিতে চায় না, তাকেও দেখে নেবে। দেখে নেবে ওই পরিবারের সবাইকে। কবিতা তাদের কাউকে ছাড়বে না।

কবিতা তাই নিজের প্রতিষ্ঠাকে আরও কায়েম করার জন্য বলে কি করবে?

কেষ্ট বলে —বাড়ির অমতেই বিয়ে করবো কবিতা। আমরা দুজনে ঘর বাঁধবো, কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না।

কবিতা চাইল খুশী ভরে।

কেষ্ট আজ মনে মনে ওদের পরিবারকে চরম আঘাত হানার জন্যই তৈরী হয়েছে। কবিতাও তাই চায়। কেষ্টোর মত একটি ছেলেকে ভরসা করে সে ঘর বাঁধতে পারে।

বিভূতি বিশ্বাস এখন আবার গদিতে বের হচ্ছে। তবে শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে। বৌমা আসতে দিতে চায়নি। বিশ্বাস মশাই বলে—ঘরে বসে থাকলে শরীর আরও ভেঙ্গে পড়বে না, গদিতে বসলে তবু পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হবে, কাজের মধ্যে থাকতে পারবো। মনটা ভালো থাকবে। লক্ষ্মী মত দেয়। তবু বলে। —গদির কাজ সেরেই বাড়ি ফিরবেন বাবা।

কামিনী ইদানীং সংসারের সব ভার বৌমার হাতে তুলে দিয়ে মন্দির আর সেবা যত্ন নিয়েই থাকে। সেদিন বিশ্বাস মশাই গদি থেকে ফিরে বাড়িতে হৈ চৈ শুনে অবাক হয়।

নীচের বসার ঘরে ঢুকতে ভোলানাথ প্রণাম করে বাবাকে। বিশ্বাস মশাই শুধোয়। —কি রে?

বলে ভোলানাথ—ভালো ভাবে পাশ করেছি বাবা।

অবাক হয় বিশ্বাস মশাই। ভোলানাথের পাশ করার সম্বন্ধে তার

কোন আশাই ছিল না। তাই বলে সে—

—এ্যাঁ! কি করে পাশ করলি তুই?

লক্ষ্মী হাসছে। ভোলানাথও জানে না কি ভাবে সে পাশ করলো। লক্ষ্মী বলে ওকে কলেজে পাঠাতে হবে বাবা। ও আরও পড়াশোনা করবে।

বিশ্বাশ মশাই এর মনে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো নিয়ে একটা আতঙ্কই হয়ে গেছে। আজ লেখাপড়া শিখে বদলে গেছে কেষ্ট। তাই যেন ভয় হয়। ভোলাও না বদলে যায়।

বিশ্বাস মশাই বলে—আবার ওকে পড়াবো মা?

লক্ষ্মী জানে ভোলানাথ কেষ্ট এক নয়। মানুষ এর স্বভাব চরিত্র এক একটা বিশেষ আদলে গড়ে ওঠে। আর সেই প্রকৃতি তাঁর সহজাত। তার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই প্রকৃতি।

ভোলানাথ সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির।

তাই লক্ষ্মী বলে সবাই এক ধাতের নয় বাবা।

বিশ্বাস মশাই ভাবছে কথাটা।

লক্ষ্মী ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে।

—ওসব কথা এখন থাক। ভোলানাথ পাশ করলো, কাল মন্দিরে ভোগ দেব বাবা। দু চারজনকে বলবো।

কামিনীও খুশি হয়েছে। তার ছোট ছেলের সম্বন্ধে সত্যিই তার ভাবনা ছিল। কেউ ভাবেনি যে ওই ডানপিটে ভোলানাথ একদিন সত্যিই পাশ করবে। আর সেই দুরন্তপনাও বদলাবে।

ভোলানাথের দুরন্তপনা ছিল মাঝেমাঝে উধাও হয়ে যাওয়া। টাকার অভাব তার ছিল না, নেইও। অবশ্য ভোলানাথও কোনদিন টাকাকে সঞ্চয়ের বস্তু বলে জানেনি।

কখনও দুদিন কখনও দশ বিশ দিনের মত কোথাও উধাও হয়ে গেছে। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে বাড়িতে।

বিভূতি বিশ্বাস চারিদিকে লোক পাঠায়, সরকার ছোটে দক্ষিণের

সন্দেশ খালি, কুমার মারি—পাঠান খালির দিকে তাদের ছড়ানো নোনা মাছের ভেড়িগুলোয় কোথায় ছোটবাবু ?

শেষ মেষ ছোটবাবু এসে হাজির। বলে বোম্বাই ঘুরে এলাম।

কোনবার বা সের দুয়েক পাঁড়া নিয়ে হাজির হয়ে বলে—দেওঘর ঘুরে এলাম। মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, লক্ষীও দেখেছে এসব সরে যায় সে।

সেটা লক্ষ্য করে ভোলানাথও।

আরও লক্ষ্য করে ভোলানাথ মেজদা ঘরে তাকে শাসন করে—এসব কি বাঁদরামি করিস ? হাসে ভোলা—দেশ ভ্রমণ করা ভালো, জ্ঞান হয়।

কত দেশ দেখা যায়, কত জ্ঞান হয় তা জানো।

—ননসেন্স্। কেষ্টলাস ইংরাজিতে বলে ওঠে।

…ওদের পরোয়া করে না ভোলানাথ।

তবু মনে হয় একজন কথাই কয়নি। সে বৌদি। বৌদি তাকে দেখে সরে গেছে। ভোলানাথ ওদিকে বারান্দায় বৌদিকে কুটনো কাটতে দেখে এগিয়ে যায়।

বৌদি যেন তাকে দেখতেও পায়নি।

ব্যস্ত হয়ে তরকারী কেটে চলেছে। ভোলানাথ বলে দেখতে ও পাও না নাকি আজকাল ?

জবাবই দিল না লক্ষ্মী। তরকারি কাটা শেষ করে হেঁসেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে।

ভোলানাথ সরে এল নিজের ঘরে।

বড্ড একা একা লাগে। তার ঘরটা একদিকে।

পিছনে দোতলার ওদিকে পুকুর। সারা বাড়ির তিন দিকেই পুকুর। বাড়ির আশপাশের পুকুরে বেশ পুরোনো মাছ রাখা যায়। দোতলার ব্যালকনিতে বসে থাকে ভোলানাথ। সারা মনে একটা নীরব গভীরতা।

বৌদির এই অবহেলাটা তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। দেশবেড়াতে

সে যেতে চায় না। মাঝে মাঝে তার বিদ্রোহী মনটা কেন জানে না এখানে থাকতে চায় না।

দেখেছে সে বাবা দাদাদের টাকা রোজকারের নানা কৌশল, জমি দখল করার চক্রান্ত। তাই ভালো লাগে না তার।

ভোলানাথ এসব ছেড়ে পালাতে চায় তাই পালায়।

বৌদিকে ঘরে ঢুকে চা খাবার রাখতে দেখে চাইল। বৌদি দেওয়ালের দিকে চেয়ে যেন দেওয়ালকেই বলে। চা খাবার রইল।

এবার বিদ্রোহের স্বরে বলে ভোলানাথ।

—ওসব নিয়ে যাও। খিদে নেই।

লক্ষ্মী যেন শোনেনি কথাটা। বের হতে যাবে বাধা দেয় ভোলানাথ। তার বিদ্রোহের কাঠিণ্য এখানে মুছে গেছে।

বলে সে মানে কাল থেকে দেখছি কথা বলছো না। যেন চেনই না এমনি ভাব দেখাচ্ছো। কি ব্যাপার বলোতো!

লক্ষ্মী শান্ত কণ্ঠে বলে—ছি ছাড়ো।

চটে ওঠে ভোলানাথ, কিন্তু বৌদির শান্ত নির্বিকার মুখের দিকে চেয়ে তার রাগটা চড়তে পারে না। ওই মেয়েটির নীরব কাঠিণ্যকে সে ভয় করে।

ভোলানাথ বলে ঠিক আছে। আমার বাইরে চলে যাওয়াই যখন এ বাড়ির সবাই চায়, আমি চলেই যাবো। এখুনিই চলে যাবো। আর ফিরবো না। কোনদিনই ফিরবো না।

সুটকেশটা তুলে নিয়ে জামা কাগড় গোছাবার চেষ্টা করে।

চাইল লক্ষ্মী। এবার বলে সে—ওসব রাখো। কথা কানে গেল?

ভোলানাথ হাত বন্ধ করেছে। তবু মুখে গজগজ করে।

রাখবো কেন? আমি তো এ বাড়ির শত্রু, বোঝা চলে গেলে অনেকের সুবিধা হয়। তাই এলে খুশী হয় না অনেকে, তা জানি। কেউ আমাকে ভালোবাসে না এ বাড়িতে—কেউনা, কেন থাকবো?

লক্ষ্মী এগিয়ে আসে। তার ওই যাযাবর বেপোরোয়া ছেলেটার

জন্য দুঃখ বোধ হয়।—এ্যাই।

ভোলানাথ চাইল বৌদির দিকে।

লক্ষ্মী এতক্ষণ যে কাঠিণ্য নিয়ে ঘুরছিল, সেই কাঠিণ্যের যবনিকা উঠে গিয়ে এবার তার চোখেই জল নামে। কান্নাভেজা স্বরে বলে লক্ষ্মী।—কেন, কেন এমনি করে উধাও হও ঘর ছেড়ে?

বাড়ির কথা, মা বাবা আমাদের কথা এতটুকুও মনে থাকে না?

এত পাষাণ তুমি! আমরা তোমার কেউ নই!

কথাটা শেষ করতে পারে না লক্ষ্মী। কি বেদনায় তার গলা বুজে বসে। দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে। কেঁদে ফেলে লক্ষ্মী!

ভোলানাথ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বৌদির এমনি কান্নায় সে অপরাধীর মত বলে।

—থামো বৌদি। সত্যি বলছি আর যাবো না।

লক্ষ্মী ক'দিন কি যন্ত্রণা চেপেছিল। মনে হয়েছিল হেরে গেছে সে ওই ছেলেটার কাছে। তাই কেঁদে হালকা হতে চায়।

ওই ভোলানাথকে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে শপথই করিয়ে নিতে চায়। যাতে পরে এমনি ভাবে পালাবার কথা সহজে না ভাবতে পারে।

মা দেখছিল তারপর থেকে ভোলানাথের হুট হাট করে বাড়ি ছেড়ে পালানোটাও বন্ধ হয়েছে। পড়াশোনায় মন দিয়েছে আবার।

সেই ভোলানাথ আজ পাশ করেছে।

বৌমা তাই মন্দিরে বিশেষ প্রসাদের আয়োজন করেছে দেখে খুশী হয় কামিনী।

সে বলে স্বামীকে—কেষ্টকেও কলকাতা থেকে আসতে বলো, সবাই আসছে। ও এ বাড়ির ছেলে, ও আসবে না?

বিভূতিবাবু জবাব দিল না।

কেষ্ট এ বাড়ি থেকে চটে মটে দু-চার কথা শুনিয়ে তার বিয়ের ব্যাপারে কঠিন প্রতিবাদ করে গেছে বাবার সামনে।

বিভূতি বিশ্বাসকে অপমানিতই হতে হয়েছিল পাত্রী পক্ষের কাছে। সোনারপুর থেকে তারা এ বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেবার আশা নিয়েই এসেছিল পর দিনই কথাবার্তা পাকা করতে, কিন্তু কেষ্ট তখন বাড়িতে নেই।

সে বাবাকে কঠিন ভাষায় জানিয়ে গেছে বিয়ে সে করবে না। তাই এদের সেই কথাটা জানাতে তারা বেশ চটে উঠে।

—খবরটা আগে দিলেই পারতেন। আপনার মত না থাক আমাদেরও তবু কিছুটা দামও আছে সময়ের বিশ্বাস মশাই।

ওরা জল গ্রহণ না করে চলে গেলেন।

বিভূতিবাবুর বাড়িতে অতিথির অভিশাপ এই যেন প্রথম লাগলো।

লক্ষ্মী নিজের হাতে খাবারগুলো এনেছিল, তার চোখেও জল আসে। মেয়ের বাবা বসে।

—ওসব নে যাও মা। দুঃখ করে লাভ নেই। দোষ তো আমারই।

এই থেকে কেষ্টকে আর বাড়ি আসতে বলেনি, তারপর থেকে কেষ্টও আর আসেনি।

শুনেছে মেজ সাহেব নাকি অফিসের জিপে করে সদর রাস্তা ধরে আরও দক্ষিণের আবাদের দিকে ইনস্‌পেকশন যায়, কিন্তু একটু ঘুরে বাড়ি আসে না।

কেষ্ট অবশ্য বসে নেই।

এর মধ্যে কবিতার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। আর তাতে সাহস যুগিয়েছে কেষ্টলালের উকিল বন্ধু অসিতবাবু আর বুদ্ধিমানের মত পরামর্শও দিচ্ছে কেশব ঘুঘু।

কেশব ঘুঘু এখন ধান্ধা দিয়ে পাওয়া জলকর-এর ব্যবসা ভালোই চালাচ্ছে।

এছাড়া হাটেও নিজের বড় দোকান গড়ে তুলেছে সার, সিমেন্ট, লোহা লক্কড় স্থানীয় এজেন্ট, সারা অঞ্চলে তার কারবার চলে, এ

ছাড়া এখন কেশব ঘুঘু হয়েছে পঞ্চায়েতে মেম্বার। চেষ্টায় আছে অঞ্চল প্রধান হতে হবে।

তার জন্য বেশ কিছু খর্চা করে দু-চারজন মেম্বারকে কিনেছে।

বাকী ক'জনকেও টোপ দিয়েছে।

একটা জিপে করে এখান ওখানে ঘোরে।

এই অঞ্চলের অনেক জনহিতকর কাজেও মদত দেয়, অবশ্য বাইরে থেকে।

আর তাই নানা মিটিংএ কিছু চাঁদা দিয়ে গলায় মালা পরে উত্তেজিত ভাবে নেচে কুঁদে ভাষণ দেয়।

তার সহার ও কিছু জুটে গেছে মধুর লোভে।

তারাও গিয়ে হাজির হয়।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এখান ওখানে। তার ভাষণ সুরু হলেই জয় ধ্বনি—হাততালি দিয়ে আবার গরম করে তোলে।

কেশব ঘুঘু কিন্তু এখনও সেই বঞ্চনা আর অপমানের কথা ভোলেনি।

সেই অতীতের বসন্তপুর জলকর নিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিল সে এই বিভূতি বিশ্বাসের জন্যই। মালিক হারাধনবাবু তাকে সেদিন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। দূর করে দিয়ে এই জলকর তুলে দিয়েছিল বিভূতির হাতে।

সেই জলকর থেকেই আজ বিভূতি সরকার গোটা তিনেক জলকর করেছে। বড় ছেলে কারখানাও গড়েছে।

বিভূতি বিশ্বাস চোখের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এখন সে এলাকার মধ্যে সম্মানিত মানুষ।

কেশব তাকে অতীতেও আঘাত করার চেষ্টা করেছিল।

তার ভেড়িতে মাছ লুট করতেও চেষ্টা করেছিল যাতে বিভূতি বিপদে পড়ে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি।

উল্‌টে নিজেই মারধোর খেয়ে পচা খালে চুবে কোন রকমে জান মান বাঁচিয়ে ফিরেছিল। সেইখানেই ব্যাপারটা চাপা থাকেনি।

তার দু-তিনলোক ধরা পড়েছিল। জলে গেছল পাঁচ হাজার টাকার জাল।

আর সেই লোকদের বাঁচাতে তাদের মুখ বন্ধ করতে, পুলিশের মুখ বন্ধ করতে উল্‌টে দশ পনেরো হাজার টাকা, গুণকার দিতে হয়েছিল।

তারপরও দু-একবার চেষ্টা করেছিল কেশব ঘুঘু পঞ্চায়েতের মেম্বার হয়ে ওই বিভূতি বাবুদের জমি জায়গা ভেড়ির ব্যাপারে বিপদে ফেলতে।

কিন্তু বিভূতিবাবুর প্রতিষ্ঠা কম নয়।

সহর থেকে তার লোকজন কলকাঠি নাড়ার ফলে কেশব ঘুঘুকে সরে আসতে হয়েছিল।

কিছুই করতে পারেনি। বরং নিজেই বিব্রত হয়েছিল।

ফলে কেশবের রাগটা মনে মনেই ছিল আর সুযোগ খুঁজছিল সে কি করে বিভূতিবাবুদের চরম আঘাত হানবে।

কেশব ঘুঘু এখন কলকাতাতেও প্রায় যাতায়াত করে।

আর আদালতের উকিল কিছু তার চেনা জানাও আছে। এই অঞ্চলের এর তার মামলা গুলোয় এখন স্বভাবের বসে কেশব ঘুঘু মাথা গলায়।

অনেকেই তার কাছে আসে পরামর্শের জন্য।

কেশব ঘুঘু তাদের পরামর্শ দেবার নামে মামলার আরও জটিল প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলে তার চেনাজানা উকিলের কাছে আনে।

তারপর উকিলবাবু এবং কেশব ঘুঘু দুজনে মিলে সেই বেচারাকে কোতল করে তিলেতিলে।

সেইসব ব্যাপারেই কেশল ঘুঘুর সঙ্গে উকিল অসিতবাবুর খুবই জানাশোনা।

প্রায়ই যায় ওখানে। সেখানেই দেখে কেশবঘুঘু কেষ্টলালকে।

ওই উকিলবাবুরই সহপাঠী।

অসিতবাবু গেছেন আইনের দিকে আর কেষ্টবাবু হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার। এখন সরকারী ইনজিনিয়ার।

কেষ্টলাল অবশ্য কেশবের পিছনের সব কিছু জানে না। কারণ গ্রামে যাতায়ত তার কমই।

কিন্তু কেশব বিশ্বাস বাড়ির সব খবরই রাখে।

শত্রুপক্ষের গতিবিধির খবর রাখা তার অন্যতম কাজ। আর গ্রাম ঘরে বোটা জানা এমন কঠিন কিছু নয়।

কেশব তাই জেনেছে বিভূতিবাবুর সঙ্গে তস্য সুপুত্র কেষ্টবাবুর ইদানীং মন কষাকষির ব্যাপারটা।

ধূর্ত কেশব পরম সমবেদনার স্বরে বলে এটা বিশ্বাস মশাই ঠিক করছেন না। কেষ্টবাবু, আপনি লেখাপড়া শিখেছেন ওই অঞ্চলের গৌরব, আপনার নিজের মতামত তো থাকবেই।

আপনি তো আজে বাজে লোক নন। গাঁয়ের সবকিছু কেন মানবেন। সুতরাং কর্তাবাবু আপনার মতে কেন মত দিলেন না—বুঝি না।

কেষ্টলাল ও তার নিজের মতের সমর্থন পেয়ে কেশবের উপর খুশি হয়।

বলে সে তাই বলুন কেশববাবু। বাবা বলেন—নিজের মতে বিয়ে করলে ও বাড়ি বিষয় সম্পত্তি কিছুই পাবো না। কেশব বলে।

—অবশ্য এসব এই বড়বাবু—আপনার বড়দারই বুদ্ধি। বিষ্টুবাবু আর ছোটবাবু ভাবেন আপনি তাদের কেউ নন। তারাই তো আনসান সাত কথা বলিয়ে বিভূতিবাবুর মত লোককে বিগড়ে দিয়েছে, অসিত উকিলও জানে সব ব্যাপারটা।

সে বলে। —তাই বলে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবে নিজের ছেলেকে?

কেশব ঘুঘু এবার তার মতলব সিদ্ধ করার পথ একটা পেয়েছে।

বাইরে থেকে নানাভাবে আঘাত দিয়েও কেশব ওই বিভূতিবাবুকে কায়দা করতে পারেনি?

এবার সে হাতে একটা দারুণ হাতিয়ার পেয়েছে, সে এই কেষ্টবাবু। ওকেই তাড়িয়ে ওদের গৃহ বিবাদটা জানিয়ে বাধাতে পারলে বিভূতি

বাবুকে চরম আঘাত হানতে পারবে।

ওর এতদিনের, এত পরিশ্রমে গড়ে তোলা প্রাসাদের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরাতে পারবে।

আর কেই সুযোগই হাতে এসে গেছে।

অসিতবাবুর কথায় কেশব বলে।

—বিষয় থেকে বঞ্চিত করা এতই সোজা! দেশে আইন কানুন নেই? বিচার নেই উকিলবাবু? এমনি বেআইনি কাজ করবেন বিশ্বাস মশাই?

এ আপনি মেনে নেবেন না কেষ্টবাবু!

কেষ্টও যেন পথ পায়। শুধায় অসিত উকিলকে।

তুমি কি বলছে!

অসিত উকিল মানুষ।

জানে বিভূতি বিশ্বাস শাসালো পার্টি, মোচড় দিলেই মধু বের হবে।

আর কেশব ঘুঘুও তৈরী।

সেও বলে।—বলুন উকিলবাবু! ঠিক বলিনি?

অসিত বলে।—না-না। ঠিকই বলেছেন কেশববাবু। তবে কি জানো কেষ্ট, এসব তোমার ব্যাপার। তুমি বাবার সঙ্গে এনিয়ে মালি মোকদ্দমা করবে কিনা ঠিক করবে।

লোভী কেষ্টলাল জানে ওই সম্পত্তির দাম আজকের বাজারে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

এত সহজে সে ছেড়ে দিতে চায় না। তাই বলে।

—বাবা এতবড় অবিচার করবেন আমার উপর। কবিতাকে একেবারে অস্বীকার করবেন—এ হতে পারে না অসিত। আমি দরকার হলে মামলাই করবো। তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা যা লাগে বলবে। কেশব ঘুঘু খুশী হয়ে বলে। গুড। ভেরি গুড।

ইদানীং সে দু' চারটে ইংরাজী শব্দও প্রয়োগ করে।

কেশব অসিত উকিলকে তার এলাকার বেশ কিছু কেস পত্র পাইয়ে

দেয়, নিজেও জামিনদারী করে। এ কেসটাও তারই দেওয়া। আড়ালে বলে—মালকড়ি যা আসবে, কিছু তার থেকে অধমকে দেবেন উকিল-বাবু, দেখবেন মামলা কত এনে দিই। দরকার হয় মামলার জন্ম দিয়েই আনবো।

মামলার জন্ম দিতে জানে কেশব ঘুঘু।

বহু লোকের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে কেশব তার পেত্রিক পদবী ওই ঘুঘুর সার্থকতাই প্রমাণ করেছে।

এহেন কেশব কেষ্টলালের সান্নিধ্যে এসে বলে—এ কর্তাবাবুর ঘোরতর অন্যায়, কি বলেন উকিলবাবু? কেষ্টবাবুর মত যোগ্য ছেলেকে কিনা অকারণে পঞ্চজনের সামনে অপমান করলেন?

অসিত উকিল বলে—সেকি হে কেষ্ট?

এখনও বাবার শাসন মানবে?

কেষ্ট কিছু বলার আগে কেশব ঘুঘু বলে—

—শাসন হলে তো কথা ছিল। এ শাসন নয়, অপমান। বিশ্বাস মশাই এর বাদশাহী মেজাজ, পয়সার গরমে ধরাকে সরা দেখেন। তাও তো লোকের কাছ থেকে। হারামের নেওয়া পয়সা।

ছেলে সোমত্ব, সাবালক, বিয়ে করবে তাও ওই বাবার পছন্দমত সেকেলে এক মুখ্যু মেয়েকে? কেন?

কেষ্টোর মনের মতই কথা বলছে কেশব। অবশ্য কেশব এই কৌশলটা ভালোই রপ্ত করেছে। জানে সে কোন দেবতাকে কি ভাবে কলে ফেলে কবে আদায় করতে হয়।

অসিত উকিলও ঢাকের বোয়ার মত গুরু গুরু শব্দ তোলে। —তা ঠিকই বলেছেন। বিয়েটা ডিপেণ্ড করছে নিজের পছন্দের উপর। বাবা কেন ইনটারফিয়ার করবেন? এ ভারি অন্যায়, বেআইনী কাজ।

কেষ্টও কথাটা ভেবেছে। বাবা অমত করলে মামলাই করবে।

কবিতাও বলে কথাটা। অবশ্য কবিতা মেয়েটি বেশ চালুই। এর মধ্যে বি-এ পাশ করে এখান ওখানে চাকরীর সন্ধান করছে, রূপ খুব

একটা নেই, বাবার সংসারের অভাবের ছাপটা কিছু তার মুখেও এসেছে, তবু কবিতা চটক আর তার কথার উষ্ণতা দিয়ে সেই দৈন্যতা ঢেকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

বলে সে কষ্টকে যদি বাবার মত না থাকে তবে এখানে না আসাই ভালো।

কেষ্টকে ইচ্ছা করেই সে আঘাত দিয়ে বাজিয়ে নিতে চায়। কেষ্ট বলে—

—ভালো মন্দ আমাকে বুঝতে দাও কবিতা।

আমি আমার মনস্থির করে ফেলেছি।

কবিতা চাইল ওর দিকে।

বলে—তাই নাকি? কি ঠিক করলে?

কেষ্ট বলে আমরা বিয়েই করবো।

খুশী হয় কবিতা।

সেও আর চাকরী, নিজের পায়ে দাঁড়ানো এসব কষ্ট সইতে পারছে না। নিজের ছোট্ট সংসার, একজনকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় সে। সুখী হতে চায় সে।

কবিতা কি ভাবছে। তার মনের সচকিত উচ্ছাসকে সে প্রকাশ করতে চায় না।

কেষ্ট ওকে নীরবে থাকতে দেখে বলে কি হল? চুপ করে রইলে যে?

কবিতা বলে—আমার জন্য আবার তোমার জীবনে অশান্তি নামবে, এ আমি চাই না।

কেষ্ট বলে সব অশান্তি আমার সইবে কবিতা। তোমার জন্য এসবই তুচ্ছ আমার কাছে।

বাড়ি ঘর, আমার সব বাঁধন ছাড়বো। তবু তোমাকে ছাড়তে পারবো না। এ বিয়ে হবেই। আর তার ব্যবস্থাও করেছি।

কেষ্ট কবিতার বাবা-মাকেও কথাটা জানায় আজ। কবিতার

বাবা ভবেশবাবু নিরীহ ভালো মানুষ, চাকরী নিয়েই হাবুডুবু খায়, সেখানে কর্তার ধাতানি আর ঘরে ফিরে গিন্নীর দাবড়ানি এর মধ্যেই বেঁচে আছে ভবেশবাবু। রেবাই এবাড়ির সবকিছু।

রেবা জানতো তার মেয়ে একদিন কেষ্টকে জালে জড়াবেই। কেষ্টর মত ছেলেকে জামাই হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাই রেবা বলে—

—বেশ তো বাবা। বিয়ে করতে চাও দুজনে, এতো ভালো কথা।

কেষ্ট বলে কিন্তু বাবার মত এখন যদি না হয় তাই আমরা রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করতে চাই, পরে অবশ্য বাবা মা মত দেবেই।

ভবেশবাবু এসব শুনে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে,

—সেকি হে? বাবা মার অমতে বিয়ে করবে? শেষ কালে—

ওর কথাবার্তা এমনিই। ভবেশবাবু চায় জীবনটাকে নিশ্চিন্ত ভাবে বাঁধা ছক ধরে টেনে নিয়ে যেতে। ছেলের বিয়ে নিয়ে তার বাবা মায়ের মনে আঘাত দিতে সেও চায় না।

কিন্তু রেবা জানে কেষ্টোর মত দামী ছেলেকে হাতে পেতে গেলে এইসব পথই নিতে হবে! এসব আজকাল আকচার হচ্ছে।

স্বামীকে বলে রেবা কঠিন ধমকের সুরে,

—তুমি থামো তো! যতো তোমার ওইসব আনসান কথা। এমনি করেই বিয়ে হয় আজকাল। বেশ মডার্ণ ব্যাপার। তা নয় ছাদনাতলা, একগাদা মেয়ের প্যাঁ পোঁ কলরব, পাত পেড়ে ছাই ভস্ম খাইয়ে দশবিশ হাজার টাকা জলে দেওয়া, এসব এ যুগে অচল! বেশ করেছো বাবা কেষ্ট। বিয়ে থা করো—শেষে একদিন কোন হলে বেশ ছিমছাম করে বন্ধুদের পাত পেড়ে খাইয়ে দিও।

কেষ্ট চন্দ্রকে অকুণ্ঠ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তার বন্ধু-বান্ধবের দলও। বিয়ে থা হয়ে গেছে।

কেষ্টোর বাসাতে নোতুন বৌকে এনে তুলেছে তারাই। কেশব ঘুঘু ক'দিন দিবারাত্রি ভলেনটিয়ারের মত পরিশ্রম করেছে! এখন সে কেষ্টোর আপনজন হয়ে উঠেছে।

ফুলকেনা, নোতুন খাট বিছানা, ফার্নিচারও কিনেছে কেষ্ট, অবশ্য সব ম্যানেজ করেছে কেশব ঘুঘুই।

কমিশনের টাকাটাও মুখবুজে পকেটে পুরে সব আয়োজন মায় পার্টির আয়োজনও করেছে কোন সুন্দর হল রিজার্ভ করে।

নামী ক্যাটারারকে দিয়ে বেশ ছিম ছাম মেনুর বুফে ডিনারও করিয়েছে।

ফ্রায়েড রাইস, ভেজিটেবিলস, চিকেন রোষ্ট, মটন কারি, চাঁটনি আইসক্রীম। আগে তো ড্রিংক, ফিস ফিঙ্গার, চিকেন বল, চীজ পকৌড়া এসব তো রয়েছেই।

বন্ধুমহলে বেশ হৈ চৈ করেই বিয়েটা করেছে কেষ্ট।

কবিতা এসেছে নোতুন বাড়িতে। এখন কেষ্টকে আবার তালিম দিচ্ছে কবিতা আর নোতুন জামাই মেয়ের কতখানি তালিম পাচ্ছে এসব দেখভাল করতে আসে রেবা নিজে।

কেষ্টের বিয়ের খবরটা ওদের দেশের বাড়িতে কে সাড়া তুলেছে এটা জানার দরকার।

রেবাও ভাবে যে কেষ্ট যদি সরে থাকে দেশের বাড়ি থেকে তাহলে ওর বাবা হয়তো সরিয়েই দেবে তার মেয়ে জামাইকে।

কেশব-এর কাছে রেবা ওর বাবা, ভাইদের সম্বন্ধে খবরও নিয়েছে। বিভূতি বিশ্বাস নাকি এক বপ্পা, কাঠ পোঁয়ার লোক। লেখাপড়া তেমনি করেনি, পরিশ্রমে আর কৌশলে এতবড় বিষয় করেছে। তাই একটু জেদি আর গোঁয়ার।

কেশব বলে। কেষ্ট, বৌমা কেন যাবে না গ্রামে। তারও পৈতৃক ভিটে। রাজপ্রাসাদ করেছে বিশ্বাস মশাই। না গেলে, বিশ্বাস মশাই এত বড় ছেলে বউমা, কান ভাঙ্গানি দিয়ে একেবারে আউট করে দেবে।

রেবা প্রতিবাদ করে—তাকি হয়?

হাসে কেশব। ওকালতি পাশ না করলেও উকিলের কান কাটে।

বলে সে।

—হয়না আবার? উইল করলেই ব্যস সব সাফ হয়ে যাবে। আমার সম্পত্তি, আমি বড়ছেলে বউ আর ছোট ছেলেকে দিয়ে গেলাম, শ্রীহরি ফেঁদে যদি একখানি এমনি উইল করে যান, মেজবাবু ফাঁকেই পড়বেন তাহলে। কেষ্টবাবুর করার কিছুই থাকবে না।

রেবা এবং তস্য কন্যা কবিতারও ছন্দপতন হবার মত অবস্থা। রেবা বলে।

—তাহলে বাবজী কেষ্ট, নিজের হক বজায় রাখার জন্যও দেশে যেতেই হবে। কেষ্ট কি ভাবছে। রেবা বলে।

তোমার বাবার খেয়াল খুশীমত সব তো চলতে পারে না। তাকে এসব কথাও ভাবতে হবে। না ভাবেন, তোমাদের নিজেদের পথ বের করে নিতে হবে। তাই ওখানে যাওয়া দরকার। ও বাড়ি, বিষয়েও তোমার দাবী আছে।

অসিত উকিল ফোড়ন কাটে। —ঠিক কথা। আইনের কথা।

কেশব ঘুঘু চোখের সামনে এক নোতুন ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করে বলে—জজেও মানবে।

শিবু মাষ্টার এখন স্কুলে পড়ানো ছাড়াও অন্য এক কাজে নেমেছে। স্কুলে মাষ্টারের মাইনে ছাড়া ইদানীং পঞ্চায়েত রাজকায়েম হতে চলেছে। তাদের পাগলা ডাঙ্গা, গোবিন্দপুরের আগেকার সেই মণ্ডলবাবুদের প্রতিষ্ঠা গেছে জমিদারী বিলোপের খাতায়। বাকী যা ছিল লেবার এসব নিয়েই গোলমাল বাঁধিয়েছে এখানের লোক।

শিবু মাষ্টার ব্লক অফিসে জে এল আর অফিসে যাতায়াত করে সেখানের বাবুদের চা পান সিগ্রেট খাইয়ে অমি, ভেষ্টেড জমির ম্যাপ পড়চা বের করে গ্রামে এসে তার অনুগত লোকদের জমায়েত করেছে।

এতদিন ধরে এই জনতার অধিকাংশ ক্ষেত মজুরি করেছে, নাহয় ভেড়িতে কাজ করেছে। জমি পাবার স্বপ্নও দেখেনি। এবার শিবু

মাষ্টার জানায়।

—তোরাও বঞ্চিত হয়ে কেন থাকবি ?

এ জমিতে হক্ আছে তোদেরও।

তাই ওরা ভালো কথায় কিছু দেবে না, আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে। তবেই দখল পাবে ওই বেআইনি জমির।

জমি। মাটি। এর উপর মানুষের টান জন্মগত। লোভ তার রক্তে। সেই জমি পাবার কথায় তাদের রক্তে মাতন জাগে। তবু দু'একজন প্রশ্ন তোলে।—যদি কোন গড়বড় হয় মাষ্টার ?

শিবু মাষ্টার বলে—তাহতে পারে তবে আট ঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে। তার জন্য থানা পুলিশ, এম. এল. এ.-কেও বলতে হবে। কিছু খর্চা টর্চাও চাই। তাই চাঁদা তোলো, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই মৌকায় শিবু মাষ্টারও এবার কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে। তার আগেই তার হাতে চাঁদা বাবদ নগদ হাজার খানেক টাকা এসে যায়।

এ্যাক্সন সুরু হয়ে পরদিন সকালেই।

গোবিন্দপুর সরকারের বিস্তীর্ণ জলাটা ছিল মণ্ডলদের দখলে। এতকাল ধরে তারাই এসব জলকরে মাছ চাষ করেছে। মাছ ধরেছে।

হঠাৎ কয়েকশো লোক লাঠি, সোটা, জাল নিয়ে এসে হানা দেয় জলকরে। কে ঘোষণা করে—এসব জলকর সরকারের ভেষ্টেড হয়ে গেছে। তোমরা চলে যাও। কিন্তু মণ্ডলরাও রুখে দাঁড়ায়।

এরাও হুঙ্কার তোলে—তারপরই সুরু হয় ভেড়ি লুঠ পর্ব। শ'দেড়েক লোকজন, মেয়েছেলে নেমে পড়ে ভেড়ির বিস্তর্ণ জলে, জাল টানছে তারা মাছ ধরছে।

ওদিকে লাঠালাঠি সুরু হয়। কে গাদা বন্দুকও চালিয়েছে।

হৈ চৈ: জল থেকে মাছ লুঠ হচ্ছে। মণ্ডলদের সামান্য পঁচিশ-তিরিশজন লোক আর কতক্ষণ যুঝবে। ওদের কিছু চোট করে, কিছুকে বেঁধে রেখে এরা জলকর এর সব ফসল এক দিনেই সাফ করে দেয়।

হাজার মণ মাছই ফাঁক, সাজানো বাগানে এত নারকেল, অন্য ফল সব তছ নছ করে দিয়ে সেই জলকরের সরকার-এর জমিতে সরকারকে কদলী প্রদর্শন করে শিবু মাষ্টারের দলবল দখল গেড়ে বসলো।

পুলিশ এসেছিলো।

কিসব কথাবার্তা বলার পর তারা রিপোর্ট লিখে চলে গেল। মণ্ডলবাবুরাও কেসই করলো। কিন্তু তখন কয়েকশো লোক জলকরে নেমে গেছে।

···চারিদিকে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে।

এই অঞ্চলে বহু জলকর, ভেড়ি রয়েছে। বিরাট আয়তনের জলকর। লাখ লাখ টাকার মাছ রয়েছে। এতদিন ধরে চুরি ডাকাতি হয়েছে। তারা অন্ধকারে এসেছে। লুটপাট করে আবার অন্ধকারে পালিয়েছে।

দিনের আলোতে এবার এক নোতুন লুটেরার দলের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা প্রকাশ্য দিবালোকে এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে এই এলাকার শান্ত জীবন যাত্রার মাঝে ঝড়ের সংকেত এনেছে।

সেদিন বামুন ঘাটার কাঁটাতে, মাছের আড়তেও একটা থমথমে ভাব নেমেছে। সকলের মুখেই ওই এক আলোচনা।

ভূধর বলে এবার ভেড়ি লুটপাট হবে হে। কিন্তু কি হবে এতে?

একটার পর একটা ভেড়ি যদি বন্ধ হয়ে যায় লুটের ভয়ে, মহাজনের কাঁচকলা হবে। মরবে গরীব মানুষ। এত লোকের রুজি রোজকার, কাজকর্ম ভাত ভিত সব চলে যাবে। এ শালো হাঁস মেরে ডিম খাবার কলছে। একদিন খেলি, তারপর কি জুটবে?

অন্য জন বলে—ওসব নেতারা ভাবছে?

কে মন্তব্য করে—শিবু মাষ্টার এসবের মূলে।

বিভূতি বিশ্বাসও এতবড় সর্বনাশা খবরে চমকে উঠেছে। গোবিন্দপুর, ওদিকে কমলপুর, গাবখালির ভেড়িও লুট হয়ে গেছে। ওসব জমিতে জল বের করে জোর করে দখল নিয়ে চাষ করা হবে।

আরও কোথায় কোপ পড়বে কে জানে? তার তিন্ তিনটে ভেড়ি।

কে জানে বুক দিয়ে যেসব সম্পদ করেছে এতদিন ধরে, সেই সম্পদ, শান্তি আর দেখে যেতে পারবে কিনা।

এমনি করে দিন বদলে যাবে তা কোনদিনই ভাবেনি। সারা দেশের মানুষকে কারা যেন কি দুর্বার লোভে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

বয়স হলে মানুষের মনের জোরও কমে যায়। বিভূতি বিশ্বাসেরও সেই জোরও আর নেই। এবার কেমন দুর্বল বোধ হয় তার।

মনে হয় এতক্ষণে বোধ হয় তার কোন না কোন ভেড়িতেই হাজির হয়েছে লুটেরার দল। সব তছনছ করে দিয়েছে।

ওই রোদেই বের হয়েছে বিভূতি বিশ্বাস।

এগিয়ে যায় রোদের মধ্যে মাঠের আলপথ ধরে ভেড়ির দিকে।

পথে বিষ্টুর সঙ্গে দেখা।

এক নম্বর ভেড়ির মাটি কাটাই হচ্ছে, ঠিক আছে তাহলে। তবু দেখছে ওই উঁচু বাঁধের উপর থেকে বিভূতি বিশ্বাস তার বাকী দুটো ভেড়িও দেখা যায় এখান থেকে।

দূর দিগন্ত অবধি জলের বিস্তার।

মাঝে মাঝে ভেড়ির উপর জলার ধারে আলাঘরগুলো দেখা যায়। ওই সব তার সাম্রাজ্য। বুকের রক্ত দিয়ে সে এসব করেছে। প্রাণ দিয়েও এসব আগলে রাখবে বিভূতি বিশ্বাস।

—বাবা। অ বাবা! বিষ্টুর ডাকে চাইল।

চোখ দুটোয় আবার দৃষ্টি ফিরে আসে। কানে শুনছে ডাকটা।

বিষ্টু বলে—এই রোদে এতটা পথ হেঁটে এলে কেন? এখন আসার দরকারই বা কি?

জবাব দেয় না বিভূতি। জানাতে পারে না ওর ভয়ের কারণ।

বিষ্টুর জানা নেই যে কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে। তাদের ভেড়িও মাঠ করে দিতে পারে ওই লুটেরার দল।

বিভূতি বলে একটু হুঁশিয়ার থাকবি। দিনকাল বড় খারাপ রে।

বিষ্টু বলে ও দেখা যাবে। গাড়িতে ওঠো। বাড়ি যাও এখন। যতসব আজে বাজে ভাবনা তোমার।

বিভূতি যেতে নারাজ। বলে—আলাঘরে থাকি একটু। বিষ্টু বলে—আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে সব লোকজন আসবে। ভোলার পাশ করার পূজো। তুমি যাও—এখানে আমরা আছি।

জোর করে বিভূতিকে গাড়িতে তুলে দেয় বিষ্টু। বিভূতি বলে হুঁশিয়ার থাকবি……

খুব হুঁশিয়ার। কেষ্টাও সব্বোনাশ ঘটাতে পারে। সহরের থেকে নাকি বদমতলব যোগাচ্ছে। কেশব ঘুঘু কানে মন্তর দিয়ে ছাড়ছে ওর। কে জানে কি করে বসে কেষ্ট।

ওই লুট পাটের সময় কেশবও ছিল ওই দলের সঙ্গে।

—সব্বোনাশ করবে ওরা। খুব হুঁশিয়ার থাকবি।

বিড় বিড় করছে আপন মনে বিভূতি বিশ্বাস।

চারিদিকের ওই আতঙ্কজনক ঘটনাগুলো তার জীর্ণ মনে একটা ঝড় এনেছে।

কামিনীর বাড়িতে আজ কাজ।

এত লোকের প্রসাদের আয়োজন করতে হবে। সেও ব্যস্ত। লক্ষ্মীর সময় নেই। সরকার মশাই, বাজার সরকার জিপ নিয়ে দৌড়াচ্ছে কলকাতায়। মালপত্র আনতে হচ্ছে।

ওদিকে ঠাকুররা রান্নার কাজে লেগেছে।

বাড়িতে ভোলানাথ এদিক ওদিকে চকির মত ঘুরছে। কখনও লক্ষ্মী ফরমাইস করে।

—ও ভোলা, ওদিকের পুকুরে জাল নামিয়ে আরও দশ কেজি বাগদা চিংড়ি তোলার ব্যবস্থা করো।

মা হাঁক পাড়ে ভোলা, ভুতোকে বল গোটা পঁচিশ ডাব আর গোটা দশেক নারকেল ভেঙ্গে দেবে। লোকজন যে কোতায় যায়। বাড়িতে কাজ, ওদের কাজ একদিন কম করার উপায় নাই।

লক্ষ্মীও মনে মনে রেগেছে তার স্বামীর ব্যবহারে। আজ বাড়িতে সকাল সকাল ফেরায় কথা, না দেখভাল করলে ঘি, চিনি, তেল এসব সরে যাবে, যাচ্ছেও। লোকটা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

ভোলা একা কি করবে।

এমন সময় বিড় বিড় করে উদাস নয়নে ওই রোদ ঘামে ভেজা বিবর্ণ দেহ নিয়ে বিশ্বাস মশাইকে দেখতে চাইল কামিনী নাট-মন্দির থেকেই।

বলে—কি ব্যাপার? একটা দিন বাড়িতে কাজ—

ওকে দেখে বিভূতি বিশ্বাস বলে ওঠে,

—হুঁশিয়ার বিষ্টুর মা, চারিদিকে শত্রু। কে কখন কি ভাবে হানা দেবে জানো না। উৎসব! এসব বন্ধ করো। এখন শান্তি নয়—যুদ্ধ। যুদ্ধ চলেছে—হুঁশিয়ার।

…চমকে ওঠে কামিনী।

এতকাল ধরে দেখছে তার স্বামীকে। ধীর স্থির হুঁশিয়ার মানুষ। সুখ দুঃখে বিচলিত হয়নি কোন দিন। বহু বিপদ পার হয়েছে পাকা মাঝির মত নৌকা সামলে।

আজ হঠাৎ যেন সব সেই মানবিক শক্তিটুকুকে হারিয়ে ফেলেছে। কামিনী এসে দাঁড়ালো ওর পাশে।

ভোলানাথ হাতের কাজ ফেলে এসেছে বাবার কাছে।

—বাবা!

এদিক ওদিকে দূরে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কি যেন দেখছে বিভূতি বিশ্বাস। ভোলার ডাকে চমকে উঠে দেখছে ওকে।

কামিনী বলে—এই ধূপ রোদে ঘুরে ঘুরে মাথাটাই বিগড়ে যাবে এইবার।

লক্ষ্মী দেখছে তার শ্বশুরকে। দোষে গুণে একটি আশ্চর্য সাধারণ মানুষ।

স্বনির্ভর, স্বপ্রতিষ্ঠিত মানুষ, বিদ্যালয়ের পাঠ নেই। সে শিক্ষা

নিয়েছে জীবন থেকে। সমাজ থেকে—মানুষের কাছ থেকে।

আজ হঠাৎ যেন কি এক প্রচণ্ড আঘাতে তার এত দিনের বিশ্বাস ধ্যান ধারণার মূলকে আলোড়িত করেছে। ঘটনাটা লক্ষ্মীও জানে।

চারিদিকে সমাজ জীবনে, অর্থ নৈতিক জীবনে এসেছে একটা বিপদের ছায়া। দিনগুলো কেমন বদলে গেছে হঠাৎ। ভেড়িতে লুট পাট হচ্ছে, বেদখল করে কেড়ে নিচ্ছে অনেক ভেড়ি। আর তার বাবাও নাকি এই দলের একজন। ওর বাবাই তাদের দলনেতা।

আজ লক্ষ্মীরও এই অসহায় মানুষটাকে দেখে তার বাবার উপরই রাগ হয়।

কি অপরাধ করেছে এরা? অত্যাচার-লুটপাট-এসব তো করতে দেখেনি এদের। বরং বিপদে আপদে পাঁচগ্রামের লোকেদের সাহায্যই করেছে। রাস্তাঘাট এদিকে কিছুই ছিল না, এরা করেছে। স্কুল দাতব্য চিকিৎসালয় এসব এখনও চালাচ্ছে এরা অনেকে ওই কাঁটা—গদি ঘরের বিক্রী বাণিজ্য থেকে।

…বাবা। ঘরে চলুন বাবা। লক্ষ্মী ওর হাত ধরে।

বিড় বিড় করছে বিভূতি বিশ্বাস। ওর মাথাটায় বেশ যন্ত্রণা, সারা দেহে তীব্র একটা জ্বালা। তেষ্টাও পেয়েছে। বিভূতি বিশ্বাস চলেছে কোন মতে টলতে টলতে।

বলে—হুঁশিয়ার বিষ্টুর মা। খুব হুঁশিয়ার। যে কোন মুহূর্তে ওরা বাড়ি এ্যাটাক করে তোমাদিকে শেষ করে ঘর বাড়ি—জলকর সব লুট করে ওদের দখল কায়েম করতে পারে ওরা।

কামিনী ওসব কথা স্বপ্নেও ভাবে না।

বলে সে—থামো তো। মাথা টাথা খারাপ হয়েছে তোমার? বৌমা, চান ঘরে জল দিতে বলো। মানুষটাকে আভাং করে চান করাতে হবে। রোদে তেতে পুড়ে এল। আর বলি—ওসব কাজ-কর্ম থাক। ক'দিন ঘরে থাকো। বের হবে না।

স্নান আহার করেছে বিভূতি বৌমার জেদে।

আহারে বিন্দু মাত্র রুচি নেই। তবু লক্ষ্মী জোর করে কিছু খাইয়েছে। ঘুমও আসে না বিভূতি বিশ্বাস যেন আজ তার মনের সব স্বস্তি, শান্তিটুকুকে হারিয়েছে।

বৈকাল বেলাতে নাটমন্দির মন্দিরকে সাজানো হয়ে গেছে। ভোলার দলবলই সব করেছে। ওদিকের মঞ্চে কীর্তন সুরু হয়েছে। কলকাতার নামী কীর্তন পার্টিকে তুলে এনেছে ভোলানাথ। আসরে বহু লোকসমাগমও হয়েছে।

লক্ষ্মীর বাপের বাড়ি থেকে শিবু মাষ্টারকেও বলা হয়েছিল, কিন্তু সে আসেনি। তার কি জরুরী কাজ পড়েছে। সে না আসাতে শান্তি পেয়েছে লক্ষ্মীই সব চেয়ে বেশী।

বিষ্টু, ভোলানাথ—সরকাররা সব তদারক করছে।

বিভূতি বিশ্বাস পাটভাঙ্গা ধুতি পাঞ্জাবী পরে অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে জড়সড় হয়ে বসে আছে দিশাহারার মত।

হঠাৎ ওদিকে গাড়ি থেকে কাদের নামতে দেখে চাইল।

বিষ্টুও এগিয়ে গেছে। নামছে এ বাড়ির মেজবাবু কেষ্ট। কামিনী লক্ষ্মীও গেছে। লক্ষ্মী বলে—এসো ঠাকুরপো।

গাড়ি থেকে কবিতাকে বউ-এর বেশে নামতে দেখে অবাক হয় কামিনী, সঙ্গে তার চেয়ে বেশী বয়সের একটি মেয়ে। বোধ হয় মেয়েটির মা। তবে সাজের বাহার এরও কম নয়।

রেবাও কিছুক্ষণের জন্য হলেও এই ফাঁকে কেষ্টর বাড়ি ঘুরে আসার জন্যই গাড়িতে এদের সঙ্গে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমে সামনে দুটি হতচকিত মহিলাকে দেখে রেবা ষ্টুঝে নিয়েছে কামিনী আর লক্ষ্মীর পরিচয়।

রেবা ওদের চুপ করে থাকতে দেখে বলে।

—নমস্কার। ঠাকরণে, আপনি তো আসতে বলেন নি। তষ্টু এলাম আমার মেয়ের বাড়ি দেখতে, আলাপ পরিচয় করে যেতে।

কামিনী চমকে ওঠে।

দেখছে সে ওদের। ওই রংরুজ মাখা আধুনিকা ভদ্রমহিলার পরণে বগল বের করা জামা, হাত দুটো ছাল ছাড়ানো ছাগলের সামনের রাংএর মত বের হয়ে আছে মাংসল হাত দুটো।

আর বউ। ওই কেষ্টর বউ না বাইজী। যা সাজ সেজেছে। বিশ্রী লাগছে।

লক্ষ্মী দেখছে ওদের।

চটে উঠেছে কবিতা। এবার শোনায়, সে কেষ্টকে।

—ভিতরে যেতে দেবে তা এই খানেই নজরদারি চলবে?

কেষ্ট বাধা পেয়ে বলে—না, না। চলো, ভিতরে চলো।

ব্যাপারটা দেখছিল বিভূতি বিশ্বাসও।

খবরটা তার কানে এসেছিল ক'দিন আগেই। আর ওই জলকর লুটের খবরের মতই এটা তার মনের ভিত্তিমূলে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছে।

ওই কেশব ঘুঘুর দলই এবার সমাজের বুক থেকে তাদের উৎখাত, নিঃশেষ করার জন্যই নানাভাবে চক্রান্ত করে আক্রমণ করে চলেছে।

জলকর সম্পত্তি, বাগান লুটপাট করছে, তারা তার সাজানো সংসারে এই ভাবে অনুপ্রবেশ করাতে চায় অমঙ্গল এর সব কিছু। তার সংসার এবার তছনছ করতে চায়।

বিভূতি বিশ্বাস এর মাথায় এবার রক্ত উঠে পড়েছে।—দাঁড়াও।

রুক্ষ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে সে। ভিড় ঠেলে টলতে টলতে এসে কেষ্টর সামনে দাঁড়ালো। কেষ্ট বাবার এমনি মূর্তি আগে দেখেনি। সে অবাক হয়।

তবু তার থামলে চলবে না। কেষ্টও কঠিন হয়ে ওঠে।

রেবা রুক্ষ কণ্ঠে বলে,—থামলে কেন কেষ্ট? চলো, ভিতরে চলো।

—না।

বাধা দেয় বিভূতি বিশ্বাস। বলে সে,

—না। এ বাড়িতে কেষ্টর কোন ঠাঁই আর নেই। আমি বলছি।

রেবাও রুখে ওঠে—তুমি কে?

চমকে ওঠে বিভূতি বিশ্বাস।

ভোলানাথও ছুটে আসে।

কামিনী ধরে ফেলে বিভূতির প্রকল্প দেহটাকে। বিভূতি বিশ্বাস গর্জায়।

—আমি কে তা জানাতে হবে? কেষ্ট পরিচয়টা দিয়ে দিবি। যা এখান থেকে ওই বাজারের মেয়েদের নিয়ে। এ বাড়ির বৌ বলে এই বিভূতি বিশ্বাস কোনদিনই ওকে স্বীকার করবে না। আর দরকার হলে তোর মত ছেলেকেও ত্যাজ্যপুত্র করবে। যা—চলে যা।

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে বিশ্বাস মশাই।

কামিনী থামাতে চায় ওকে—ওগো। থামো এখন,

—না। এখুনিই, এখানেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে?

বিশ্বাস মশাই এর জেদ চেপে গেছে। সামনে আজ সেই কল্পিত শত্রুদের দেখে সে মরীয়া হয়ে উঠে প্রতি আক্রমণ চালিয়েছে।

রেবাই জেরা করে এবার।

—কিসের হেস্তনেস্ত করবেন? আপনার ছেলেরও এই সম্পত্তিতে আইনতঃ হক আছে, তার আইনতঃ স্ত্রীরও—

সরকার মশাই বলে,—এখন এসব আলোচনা থাক। পরে আসবেন মা। এখন দয়া করে যান।

কেষ্ট গর্জে ওঠে—

নেভার। আমি ভিতরে যাবো। পারো বাধা দাও।

বিভূতি বিশ্বাস গর্জে ওঠে। —না। খবরদার ভিতরে যাবে না।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। চোখ মুখ উত্তেজনায় কপালে উঠেছে।

লক্ষ্মী হাঁক ছাড়ে—বাবা! ছোট ঠাকুরপো—

ভোলানাথ এসে দাঁড়াবার আগেই কেষ্ট জোর করে ভিতরে যাবার

জন্য একটু ধাক্কা দিয়েছে বাবাকে, বিশ্বাস মশাই জোরে কি চীৎকার করার আগেই ছিটকে পড়ে মেজেতে।

ছুটে আসে কামিনী, বিষ্টু, ভোলানাথও।

কামিনী আর্তনাদ করে—একি সর্বনাশ হ'ল রে।

নিমেষের মধ্যে ওই আনন্দ মুখর পরিবেশে একি দুঃখের আভাস, নেমে আসে। সব তছনছ হয়ে গেল।

একরাতের মধ্যেই এই বিশ্বাস বাড়ির সমস্ত পরিবেশটা বদলে গেছে। সেই আনন্দমুখরতা আর নেই। সারা বাড়িটায় নেমেছে শোকের বিষণ্ণতা।

বিভূতি বিশ্বাসএর দেহটা আগেই ভেঙ্গে ছিল, তবু একটা ভরসা, মনের জোর নিয়েই বেঁচেছিল সে।

তার যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশীই সে রোজকার করেছিল। সেই সম্পদের কল্পিত বিচ্ছেদ বেদনাতেই ভেঙ্গে পড়েছিল সে। ভীরুরা প্রকৃত মরার আগেই বেশ কয়েকবার মরে থাকে।

আজ আর বিশ্বাস মশাই ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থেকে মারা গেলো। ছেলেকে ওই বিজাতীয় বউ নিয়ে এসে দলবল সমেত তার দুর্গে হানা দিতে দেখে সেই যে পতন ও মূর্চ্ছা হয়েছিল আর জ্ঞান ফেরেনি।

ভোলানাথ এবার বেশ বুঝেছে তার সামনের দিনগুলোর সঙ্গে অতীতের দিনগুলোর কোন মিলই হচ্ছে না।

এতদিন সে নিশ্চিন্তে বট গাছের ঘন স্নিগ্ধ ছায়াসবুজ আশ্রমেই ছিল, সেই আশ্রয়টা আজ নেই।

কে যেন নিষ্ঠুর আঘাতে সেই মহীরুহকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, স্নিগ্ধ ছায়াটুকু হারিয়ে গেছে ভোলানাথের জীবন থেকে, সে এসে পড়েছে রৌদ্রের খরতাপ দগ্ধ পরিবেশে।

বাবা মারা গেলো। তার চোখের সামনে দেখেছিল ভোলানাথ বিভূতি বিশ্বাসকে শেষ হতে।

মা আছড়ে পড়ে বাবার প্রাণহীণ দেহটার উপর। দাদা কাঁদছে। কাঁদছে বৌদিও। এবাড়ির কেন—এবাড়ির বাইরের অনেক মানুষই, ভোলানাথের মনে হয় তারও অনেক কিছু হারিয়ে গেছে।

কদিন কেটে গেল অশৌচ, শ্রাদ্ধ শ্রান্তির মধ্য দিয়ে। কেষ্টলালও খবরটা পেয়েছে কলকাতাতে।

সেই রাতে ওরা বাবার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরেছিল কলকাতায়। কবিতাও নিজেকে অপমানিত বোধ করেছিল। রেবা বলে এব্যাপার-টাকে সহজে ছাড়বো না।

কবিতা বলে ওই হ্যাকনিড মানুষগুলোর সঙ্গে এক মিনিটও থাকতে পারবো না মা। ওই ভিলেজে যেতেও পারবো না। আনকালচারড ওরা।

রেবা বলে—ওখানে যেতে হবে শুধু ওই বিষয়ের দাবী আদায় করতে, নাথিং বাট দ্যাট।

পরে বাবার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছতে রেবাই এসে পড়ে। বলে সে শ্রাদ্ধদিতে যাবে কেষ্ট?

কেষ্ট কি ভাবছে।

কেশব ঘুঘু, অসিতবাবু উকিল এখন এবাড়ির নিয়মিত অতিথি। কেশব ঘুঘু দেশের বাড়ির সব খবরই আনে। ধূর্ত লোকটা নিজের আসলেমি আর বদ খেয়ালের জন্য একদিন বেশ কিছু সম্পদ হারিয়ে এখন সেই অক্ষমতাকে প্রতিশোধের জ্বালায় পরিণত করে ওই বিভূতি বিশ্বাসদের মত মানুষদের ধ্বংস করতে চায় সে।

আবার তাদের সবকিছু লুট করে নিতে চায়।

তবে সেই কাজের রূপটা হবে স্বতন্ত্র।

কেশব তাই কেষ্টকেই ভয় করেছে।

কেষ্টর ওই বাড়িতে যেতে আর বাসনা নেই। বলে সে, সেখানে

গিয়ে কি করবো ?

কেশব ঘুঘু বলে, মাসীমা ঠিকই বলেছেন। এটা আইনের কথা। শ্রাদ্ধে যোগ দিয়ে তোমার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে কেষ্ট। কে জানে বুড়ো কোন উইল-ফুইল করেছে কিনা।

অসিত উকিলও বলে, করেক্ট। ঠিক বলেছে কেশব। যাওয়া দরকার কেষ্ট। বৌঠান না যাক, তুমি গেলেই হবে। আর কেশব, খোঁজ খবর নাও হে তেমন কোন উইল টুইল করেছে কি না। ওর দাদাটি ক্যামন ব্যক্তি ?

কেবশ চেনে বিষ্টুকেও। বিষ্টু এমনিতে নিরীহ, সাতে পাঁচে থাকে না। মন দিয়ে ব্যবসাপত্র করে। তবু ভয় হয় এখন কেশবের বিষ্টুর শ্বশুরটিকে।

শিবু মাষ্টার এখন মাষ্টারি ছেড়ে দিয়ে (অবশ্য অনেকে বলে খাতায় নাম তার ঠিকই আছে, মাসে মাসে মাইনেও নিয়ে আসে, কাজ না করেই।

এখন নেতা সেজেছে। ওই এলাকার বহু মানুষজন এখন তার কথায় ওঠা-বসা করে, অনেককে নাকি জমি টমির মালিকও করে দিয়েছে। আর তার নামেও অনেক কথা শোনা যায়। সব অবশ্য ভালো কথা মোটেই নয়।

কেশবের সে এখন প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কেশব ঘুঘুকে ছাড়িয়ে এবার সেইই এম. এল, এ হবার স্বপ্ন দেখছে।

কেশবকে কি ভাবতে দেখে বলে অসিতবাবু, কি ভাবছো হে ?

রেবাও দেখেছে ব্যাপারটা। বলে সে, তুনিই খোঁজ খবর নাও বাবা অসিত। মেয়েটা শেষে পথে না দাঁড়ায়।

কেশব ঘুঘু আশ্বাস দেয়,—কি যে বলেন মাসীমা ?

বিষ্টু বাবা মারা যাবার পর এতসব ঝামেলা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। বাবা এক জীবনে কম রোজগার করে নি।

বিষ্টু বলে ভোলানাথ, এবার আড়ত, কাটা তুই দেখাশোনা কর, জমি জায়গাও দেখ ভাল করে। সরকার মশাইরা সব দেখিয়ে দেবেন। আমি এদিকে ভেড়িগুলো দেখ ভাল করি।

কথাটা ভাবছে সেও।

বাবার ভাবনাটা দেখছিল বিষ্টুও। এর মধ্যে ভাঙ্গড়ের দিকে দু-একটা ভেড়ি লুট হয়েছে নোতুন করে। তাই বিষ্টু ভাবছে খদ্দেরর পেলে দুটো ভেড়ি বিক্রীই করে দেবে।

এখন ব্যবসা আর রাখা যাবে না বড় করে। সারা দেশে একটা গোলমালই সুরু হয়েছে।

কামিনীও ভাবনায় পড়েছে। এতকাল কেটেছে তার এক ভাবে। লোকটা আজ নেই তা এখনও যেন ভাবতে পারে না কামিনী। এই ঘর মন্দির, নাটমন্দির সব শূন্য মনে হয়।

কামিনীরও প্রয়োজন যেন ফুরিয়েছে এই সংসারে। এখানে আর তার করার কিছু নেই!

—মা।

লক্ষ্মীর ডাকে চাইল কামিনী, শূন্যতায় ভরা সেই চাউনী। লক্ষ্মীও দেখছে কামিনীর এই নিঃস্ব বেশবাস।

হাত দুটো খালি, পরণে এখন সাদা থান।

রিক্ততার প্রতীক। লক্ষ্মী বলে—

—স্নান করে পূজো সেরে নেবে চলো মা। বেলা হয়েছে।

—পূজো, হাসল কামিনী। জীবনভোর পূজোই করে এসেছে, আজ তার জীবনে তবু এই বিপর্যয় ঘটেছে। তবু সেই সংস্কারবদ্ধ মন পূজোর কথা ভুলতে পারে না। কামিনী শুধোয়—বিষ্টু, ভোলা?

লক্ষ্মী জানায়—ওরা কাটায়, ভেড়িতে গেছে।

দেখা যায় একটা জিপ ফিরছে দূরে ভেড়ির সরু বাঁধ দিয়ে বেশ বেগেই। গাড়িটা চালাবার ধরণ দেখেই বোঝা যায় ওটা চালাচ্ছে ভোলানাথই, যেন উড়ে আসতে চায় ও।

কামিনী বলে—ভোলাকে একটু বলো বাছা, ওই ভাবে যেন গাড়ি না চালায়! কোনদিন বিপদ ঘটাবে।

লক্ষ্মীও জানে ভোলার স্বভাব। ওকে বলেও পারে নি।

এমন সময় সশরীরে ভোলাকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে দেখে লক্ষ্মী বলে—ছোটবাবু, গাড়ির চাবিটা দাও তো?

ভোলা ইদানীং ওই জিপটার দখল নিয়েছে। বৌদির কথায় বলে—

—চাবি? কি হবে?

লক্ষ্মী বলে দাও তো, মানে চালাবো।

ভোলা হেসে ওঠে—সত্যি চালানো শিখবে? মেমসাহেব হবে? ভেরি গুড। বলো তো আমিই শিখিয়ে দেব।

লক্ষ্মী চাবিটা নিয়ে বলে—ওটা আমার কাছে রইল। আস্তে আস্তে যখন চালাতে শিখবে তখন পাবে, এখন নয়। বুঝলে।

ভোলা এইবার বিপদের গুরুত্ব বুঝে বলে,

—মাইরী বৌদি। আর হবে না। চাবিটা দাও—

আজ বিকেলে তার টিমের ফাইন্যাল খেলা, দু-তিনটে প্লেয়ার আনতে হবে বেলেঘাটা থেকে, গাড়ি না থাকলে বিপদই হবে। তাই কাকুতি-মিনতি করে। বিষ্টুও এসে পড়ে।

সে দেখে ভোলানাথ-এর সঙ্গে লক্ষ্মীর ওই নাটকটা।

লক্ষ্মী যেন এবার শ্বশুর মারা যেতে এবাড়ির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। তাই যেন বাড়াবাড়িই করছে সবদিকে।

রোদে ঘেমে নেয়ে এসেছে বিষ্টু তার দিকেও নজর দেবার সময় নেই, বিষ্টু দেখেছে নীচের মহলে লক্ষ্মী রান্না বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত।

বিষ্টু এবার বাবা মারা যেতে ক্রমশঃ ব্যাপারটা নিজেও ভেবেছে। কেষ্ট একবার শ্রাদ্ধের দিন এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে। এ বাড়ির বিষয় আশয় নিয়ে তার হিসাব লাভ এর কড়ি নিয়ে

আলোচনা করতে এসেছিল কয়েকদিন পর কেষ্ট চরণ।

সেদিন কামিনী অবাক হয়। বিষ্টু ভিতরে এসে মাকে জানায় ওদের আসার কথাটা। কামিনী গুম হয়ে বলে।

—ওরা তো নিজেদের স্বার্থে এসেছে। আর কেষ্টর যদি বিষয় আশয়ের কথা বলার দরকার সে নিজে এলেই পারতো। সেই শাশুড়ী উকিল এসব নিয়ে আসা কেন?

ভোলানাথ বলে—হাঁটিয়ে দোব? গাড়িটা কেড়ে নোব?

লক্ষ্মী জানে ভোলানাথ এখুনি দলবল নিয়ে অনর্থ বাধাবে।

বাধা দেয় সে—ওসব করবে না।

কামিনী বুঝেছে কেষ্টর মতিগতি ভালো নয়। ওই শাশুড়ীর পরামর্শে সে চলছে। তার কাছে ও আসেনি কেষ্ট।

কামিনী বলে—কোন পাকা কথা বলবে না। ও কি বলে শুনে নাও। উত্তর চাইলে বলো মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে জানাবো।

কেষ্ট এসে সেদিন নিজের দাবীই জানিয়েছে। সঙ্গে এসেছিল কেশব ঘুঘু উকিলবাবুও। রেবা বলে,—জামাই এর ভালো তো চাই।

কেষ্টও বলে—তাই এলাম। গ্রামের পঞ্চজনকে ডেকে এনে একটা বণ্টন নামা করাতে চাই।

কেশব বলে—তাহলে ডাকি দু'চারজনকে?

ভোলানাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে কথাটা। সে বলে ওঠে,

—ঘুঘু মশাই ফাঁদ দেখেছো?

কেশব চটে ওঠে—কথা শুনাচ্ছো বিষ্টু ভাইকে দিয়ে?

বিষ্টু বলে—না না আলোচনা তো হবেই। তবে এখুনিই সময় হবে না। আর কেষ্ট তোর আলোচনায় বসতে হয় নিজে আয় সময় নিয়ে। আমাদের বাড়ির ব্যাপার আমরাই ব্যবস্থা করবো। বাইরের কাউকে ডাকাডাকি করতে চাইনা।

কেষ্ট বলে—আজ কিছুই হবে না?

ভোলানাথই বলে—দাদাতো বলেছে যা বলার, শোননি?

উঠে পড়ে কেষ্ট। কেশব আর ফুট কাটেনি। সেও ভয় করে ভোলানাথকে। কোন রকমে উঠে এল ওরা গাড়িতে।

তারপর কেষ্ট আর আসেনি, উকিলের চিঠি পাঠিয়েছে। বিষ্টুও ভাবনায় পড়েছে। সেই চিঠি পেয়ে।

মনে হয় সে একাই এত বিষয় আগলে পড়ে আছে কেন? নিজের টুকু নিয়ে সবারই বিষয় ভাগ করে দেবে।

লক্ষ্মী ওই কথা শুনে অবাক হয়,

—সেকি! মেজঠাকুরপো তো এসব বেচার জন্য বসে আছে।

ভোলানাথ বলে—ওই ব্যাটা কেশব ঘুঘু জুটেছে, ও অনেকের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়েছে, এদিকে এলে টুটি টিপে শেষ ভেড়ির কাদায় পুঁতে দেব।

বিষ্টু শোনায়—ওসব কথা বলবি না। যা তো—

ওকে সরিয়ে দিয়ে বিষ্টু বলে লক্ষ্মীকে।

—এসব ঝামেলায় যাচ্ছি না। নিজেরটা নিয়ে ওদের ভাগ ফেলে দোব।

ও যা ভালো বোঝে করবে।

লক্ষ্মীর ভাবনা ওই মা আর ভোলানাথের জন্যই। দেখেছে সে তার শ্বশুর মশায় কি ভাবে বিষয় রেখেছিল। লক্ষ্মী বলে,

—তারপর সাজানো বাগান সব শেষ হয়ে যাবে? মা, ওই ভোলানাথ ভেসে যাবে? তুমি বড় ভাই হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?

বিষ্টু কথাটা শোনে মাত্র।

মনে হয় যত সহজে মুক্তি পাবে ভেবেছিল ওই লক্ষ্মীর জন্যই মুক্তি পাবে না।

বিষ্টু তবু বলে—এসব পরের ঝামেলা সইতে হবে?

—পর! অবাক হয় লক্ষ্মী।

বলে সে—ভোলানাথ হ'ল পর? আর মেজবাবুর ওখানে আমি

নিজে যাবো! দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা ক'মাস গেছেন এর মধ্যেই এই সব করবে? লোকে বলবে কি?

আর ভোলাও তো কাজ দেখছে, ও তোমার দোসর হবে।

বিষ্টু চটে ওঠে, ভোলানাথই ওর কাছে সব। নিজের স্বামীর কথাও ভাবে না।

বিষ্টু বলে—তোমাকে বোঝতে পারবো না, আমাদের সরে থাকাই ভালো।

—না। লক্ষ্মী শোনায়—মা, ভোলাকে ছাড়তে পারবো না। এ হয় না। একবার বাড়িতে ফাটল ধরলে সেই ফাটল বোজানো যাবে না গো, এই প্রাসাদে ধ্বসিয়ে দেবে। এ আমি হতে দেব না।

বিষ্টু বিপদে পড়েছে।

কথাগুলো শুনেছে ভোলানাথ। সেও এসব এতকাল ভাবেনি, এতদিন বাবা, দাদা মা আর বৌদির ছত্রছায়ায় পরম নিশ্চিন্তে বাস করছে।

টাকা পয়সার ভাবনা ছিল না, গদি থেকে হাত মুঠো টাকা তুলে নিয়ে কোথাও উধাও হয়েছে দেশান্তরে, বন পাহাড়ের রাজ্যে।

ঘরে এসে খেলা ধূলো হৈ চৈ নিয়েই ছিল। এবার হঠাৎ সেই নিশ্চিন্তে জগৎ থেকে উষর তপ্ত রোদের মাঝে পড়েছে, ছায়াতরুর ইঙ্গিত নেই।

দাদাদের ব্যাপারটাও দেখেছে। মেজদা তো বাইরে থেকে এবাড়ির উপর চরম আঘাত হানতে চায়, বড়দাও মুক্তি পেতে। যার যা ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে নিজে তার নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতে চায়।

মায়ের কথা মনে পড়ে ভোলানাথের। মা এখন একটি যেন স্তব্ধ পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে মন্দির চাতালে বসে থাকে যেন এই সংসারের থেকে সে নিজের সরিয়ে নিয়েছে দূরে। আজ ভোলানাথ একা। এ বাড়িতে হৃদয়ের ছোঁয়াটুকু ও যেন মুছে গিয়ে এক কঠিন পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

ভোলানাথ বলে বৌদিকে—এ প্রাসাদ কতদিন বজায় রাখবে বৌদি ?

লক্ষ্মী চাইল। শুধোয় সে—কি হল ?

ভোলা বলে—সব শুনেছি বৌদি। যে যাবার সে যাবেই। তাকে আটকাবার চেষ্টা করা বৃথা। দাদাকে কেন বাধা দিচ্ছ ?

লক্ষ্মী শোনায়—যা ভালো বুঝেছি করেছি।

ভোলা বলে—চেষ্টা করে ছাখো যদি পারো তাহলে এ বেচারারই ভালো হয়। ওদিকে মেজবাবু তো তাল ঠুকছে, কেশব ঘুঘুও রেডি। কোর্টে না হাজির করে।

—তবু বাধা দেবই। লক্ষ্মী শোনায়—বলে সে

তুমি একটু সাহায্য করো ভাই।

ভোলানাথ এর সারা মনে কি শূন্যতা জানে। তার যেন করনীয় কিছুই নেই।

গদিতে আসে ভোর বেলাতেই, লক্ষ্মীই ডেকে তুলে দেয় তাকে। ভোলনাথ তাকিয়ে দেখে। বিষ্টুও বের হয় ভেড়িতে।

মাছ আসতে থাকে কাঁটায়। এখন ভোলানাথও বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে।

সরকার মশায় দর হাঁকছে—মাছের বিক্রীও ভালো দরেই হয়।

এখানের পাট চুকিয়ে টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে ভোলানাথ চলেছে ভেড়ির দিকে।

নিজেই ওই কাঁচা রাস্তায় জিপ চালিয়ে চারিদিকে টহল দেয়। কোথায় কি কাজ হচ্ছে তার তদারক করে। বিষ্টু বলে,

—কোলাঘাট চলে যা, নোনা ডিম আসবে।

ভোলানাথ মজুরের মত খাটে,—বলে, 'ভেড়ির কাজ ভালোই চলবে।'

সেদিন দুপুরে হঠাৎ দু'নম্বর ভেড়ির ওদিকে আসছে এ পাশের বাগানের মধ্যে আলাঘরে গিয়ে একটু অবাক হয় ভোলা।

কেষ্ট এসেছে সঙ্গে দু'তিনজন ভদ্রলোক, আর দালালি করবে কেশব ঘুঘু।

সেই উকিলবাবুও রয়েছে, ডাব পাড়া হয়েছে, সরকার মশাই নৌকা বিয়ারের একটা পেটি নামাচ্ছে, হঠাৎ ভোলানাথকে দেখে একটু অবাক হয়, ছোটবাবু আপনি ?'

ভোলানাথ শুধোয়—'মালপত্র আসছে কি ব্যাপার ? ওদিকে রসুই ঘরে একরাশ মাছ ভাজা হয়েছে। একটা বড় থালায় মাছ ভাজা সহযোগে বিয়ারের শ্রাদ্ধ চলেছে।

কেষ্ট এসেছে, কেশবই খরিদ্দার ঠিক করেছে। এই দু'নম্বর ভেড়িটা কেষ্টোর নামে রয়েছে বিশ্বাস মশাই এর আমল থেকেই, এবার কেষ্ট ওটা নিজেই বিক্রী করার ব্যবস্থা করছে।

আর এ ব্যাপারে তৈরী হয়েছিল কেশব ঘুঘু, সে দু'দিক থেকেই বেশ মোটা অঙ্কের দালালী পাবে, তাই খদ্দেরদের আজ দেখাতে এনেছে ভেড়িটা। দরদামও হবে।

এই আলাঘরের সরকারকে হাতে করেছে কেষ্ট, কিছু টাকা তাকেও দেবে আর নোতুন মালিকরা তাকেই সরকার করে রাখবে, সুতরাং গজেন সরকারও তাই উঠে পড়ে লেগেছে।

এখন দেখ ভাল করে বিষ্টুবাবু নিজে, তাকে ঠকাবার পথ নাই। সে জানে শোনে ভেড়ির হালচাল। তাই সরকার বেশী কিছু পাবার আশাতে আজ এদের গোপনে আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করেছে।

বিষ্টুবাবু নেই, সুতরাং আজই ওদের আনার কথা বলেছিল, কিন্তু ছোটবাবুকে হঠাৎ এখানে এসে পড়তে দেখে তাই বিপদে পড়েছে।

ভোলানাথ শুনেছে কথাগুলো। এবার সেও বুঝেছে এদের আগমণের উদ্দেশ্য। ভোলানাথ তাই এগিয়ে এসে বলে।

—কি ব্যাপার মেজদা ? এ ভেড়ি বিক্রী করতে চাও তুমি ? কেষ্ট ইতি উতি করে।

ওদিকে ঘাটের বাঁধানো চাতালে ওরা বিয়ারের বোতল মাছ ভাজা

সাজিয়ে বসেছে, দেখে খদ্দেররাও খুশী।

বিশ্বাস মশাই পাকা আলাঘর, গাছ-গাছালি দিয়ে সাজানো বাগানও করেছে। এলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ফলে খদ্দেররাও খুশী। আর কেনার মনস্থও করে ফেলে। দরকার হলে বেশী টাকাই দাম দেবে তারা।

কেশবও তাই উঠেপড়ে লেগেছে শুভকাজ শেষ করতে।

তাজা বিয়ারের স্বাদ মাছ ভাজার সঙ্গে জমে উঠেছে। ওরা বলে —কলকাতায় গিয়ে সন্ধ্যাতেই বসা যাবে। যাতে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই কাগজপত্র হয়ে যায় তাই দেখতে হবে।

কেশব ঘুঘুও তাই চাই—

একবার সই সাবুদ হয়ে গেলে দখলও দিয়ে দেবে। দরকার হয় লোকজন নিয়ে ঢুকে যাবে আলাঘরে, ভেড়িতে জাল নামাবে তাহলে দখল পেয়ে যাবে। কেশব বলে—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কেষ্টও হিসাব করছে সাদা কালোয় দশ লাখ টাকা পেলে তার আপত্তি নাই। আর বাকী জমি জায়গার ব্যবস্থা পরে হবে।

কিন্তু ভোলানাথকে দেখে বলে, —তুই এখন যা।

ভোলা যাবার নাম করে না। বলে সে,

—দাদাকে খবর না দিয়ে এখানে এলে কেন? খদ্দেরকে দেখাতে এসেছো?

কেশব ঘুঘু বলে—এখন যাও তো।

এবার রুখে ওঠে ভোলানাথ—তুমি এখান থেকে চলে যাবে ঘুঘু, নাহলে—কেষ্ট গর্জে ওঠে—কি করবি?

কেশবও বলে সাহস পেয়ে—কি করবি হে?

ভোলার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

ওই শয়তানটার উপর তার রাগ চিল অনেক দিনের। আজ হাতের কাছে পেয়ে কেশবকে চুলের মুঠি ধরে তুলে দু'হাত দিয়ে ওর শীর্ণ দেহটা শূণ্যে দু'হাতে ছুঁড়ে দেয় ভেড়ির দিকে।

আর্তনাদ করছে কেশব শূন্যে দু'হাত মেলে কিছু করার আগেই কেশবের দেখটা সশব্দে ভেড়ির জলে পড়ে তলিয়ে যায়।

অবশ্য জল বেশী নয়, ডুবে চুবে কাদা মেখে উঠল কেশব তখন আর চেনা যায় না তাকে।

খদ্দেররাও একটু ঘাবড়ে গেছে এই কাণ্ড দেখে।

ভোলানাথ বলে—

মদের আসর তুলে এক্ষুনি কেটে পড়েন মেজদা, আলাঘরে এসব করো না। ওঠো—

গর্জে উঠে ভোলা—নাহলে তোমাদের এক একটাকেও ওই শালা ঘুঘুর মত চুবিয়ে দেব ভেড়ির জলে।

কেষ্ট কিছু বলার আগেই অসিতবাবু, ওই খদ্দেররা পায়ে পায়ে সরে গেছে ওদের ভ্যানটার কাছে।

কেষ্টও বিপদের গুরুত্ব বুঝে আত্মরক্ষার জন্যই চলে যায় গাড়িতে। গাড়িতে উঠে শাসায়।

—কাজটা ভালো করলি না ভোলা। আমিও দেখে নোব।

ভোলা বলে—

যা পারো করো। এখন কেটে পড়ো তো। ভোলা চাতালের উপর সাজানো বিয়ারের বোতল কটাকে লাথি মেরে জলে ফেলে দিয়ে সরকারকে ধরেছে।

—সব জানো তুমি? তলেতলে এই করছো?

গজেন সরকার ছোটবাবুর কীর্তির খবর কিছু রাখে, আর একটু আগেই এই পৌষের শীতে কেশবকে কাদায় চুবিয়েছে, সরকার আর্তনাদ করে।

—ক'দিন জ্বর চলছে ছোটবাবু, দোহাই জলে ফেলবেন না। আমি এসব কিছু ভেতরের ব্যাপার জানতাম না, মা কাল্লির দিব্যি করে বলছি।

ভোলানাথ ওকে স্রেফ দু'টো ঝাঁকানি দিয়ে ছেড়ে রেখে এল।

তাতেই গজেন সরকারের কাঁপিয়ে জ্বরে আসে।

বিষ্টু বাড়ি ফিরে খবরটা শুনে অবাক হয়।

আরও অবাক হয় দারোগাবাবুকে দলবল সমেত আসতে দেখে। কামিনীও মন্দিরে বসেছিল সেও শুনেছে খবরটা।

সরকার বলে,

—ছোটবাবুকে নাকি পুলিশ এ্যারেস্ট করতে এসেছে? বাবু বাড়িতে রয়েছে।

কামিনী খবরটা শুনে চমকে ওঠে—সেকি!

ভোলানাথ অবশ্য গ্রামের আশপাশের গ্রামের অনেক ঝামেলাতে থাকে। তেমনি কিছু গোলমালই হয়েছে বোধ হয়।

মা গজগজ করে—একদিন জেলে যাবে নির্ঘাৎ।

মায়ের মন, তবু আসছে ওদিকে। লক্ষ্মীও ঝিয়ের মুখে খবরটা শুনে নেমে আসে।

দারোগাবাবু বলেন—

আপনার মেজভাই যখন অভিযোগ করেছেন তখন সত্যিই এটা। উনি ভেড়ির আলাঘরে এসেছিলেন বন্ধুদের নিয়ে, সেখানে চড়াও হয়ে ভোলানাথ ওদের মারধোর করেছে। ওকে থানায় যেতে হবে!

বিষ্টুবাবু অবাক হয়! ভোলা বলে,

—মারধোর করি নি। ওরা আমাদের না জানিয়ে ভেড়ি বিক্রী করতে এসেছিল, দখল নিতে এসেছিল তাই প্রতিবাদ করেছি।

বিষ্টু খবরটা শুনে অবাক হয়—

সেকি! ভেড়ি বিক্রী করতে চায়। কত লোকজন এসেছিল তারজন্য!

—হ্যাঁ। মদের ফোয়ারা বসিয়েছিল আলাঘরে। কোনদিন ভেবেছো এসব? উনি তাই করছিলেন। সঙ্গে ছিল দালাল কেশব ঘুঘু—

কামিনীও চমকে ওঠে। এমনি করে শত্রুতা সুরু করবে তা কেষ্ট

তা ভাবেনি সে। দারোগাবাবু বলেন,

—কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন ?

বৃন্দাবন সরকার এদের এষ্টেটের পুরানো কর্মচারী, সে বলে—ওসবই তো বুঝেছেন দারোগাবাবু। খামোকাই ঝামেলা, যা হয় রিপোর্ট করবেন। চলুন—

বৃন্দাবন সরকারই দারোগাবাবুকে রিপোর্ট লেখাতে নিয়ে গেল, আর তারজন্য ভেড়ির মাছ, অন্য কিছুও নিবেদন করতে হবে এসব খবর তার জানা। তাই দিয়ে আজকের মত টাকা দেয়।

কিন্তু ব্যাপারটা ওইখানেই চাপা থাকবে না তা বুঝেছে বিষ্টু।

কামিনীও বলে—

কর্তা যাবার পরই এইসব শুরু হল ?

বিষ্টু তার সুরে বলে তাই ভাবছি মা, যার যা ফেলে দিই। আমারও ভালো লাগছে না এসব থানা পুলিশ, কোর্ট, কাছারি।

—'তাকি হয় ? এত সহজে হাল ছাড়লে চলবে না বাবাজী !' সকলেই চাইল ওই নবাগত ব্যক্তিটির দিকে।

তিনি আর কেউ নন স্বয়ং শিবু মাষ্টার।

সম্পর্কে বিষ্টুবাবুর শ্বশুর মশায়।

কামিনী ওকে দেখে খুশীই হয়—

আসুন বেই মশায়। লক্ষ্মী বাবাকে দেখে ঠিক খুশী হতে পারে না। সে একটু অবাকই হয়েছে, মনে হয় এই সুখের সংসারে ঝড়ের পূর্বাভাষ নিয়েই যেন ও এসে পড়েছে।

বিষ্টু বেশ বিপদেই পড়েছে, বাবা মারা যাবার পর থেকেই একটার পর একটা বিপদ হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির হয়েছে, ভেড়ি আড়তের এত কাজ তারপর কোর্ট ঘর করা তার পোষাবে না। ভোলানাথ এখনও কাজগুলো ঠিক রপ্ত করতে পারে নি। সরকারের উপর ভরসা করা যায় না সব সময়। ভাবনায় পড়েছে সে।

শিবু মাষ্টারকে আসতে দেখে চাইল বিষ্টু।

ভোলানাথও রয়েছে। বিষ্টু বলে—আসুন।

বলে শিবু মাষ্টার,

খবরটা কানে যেতে আর স্থির থাকতে পারলাম না বাবাজী তাই নিজেই এলাম।

ওই কেশব ঘুঘু নাকি কেষ্ট বাবাজীকে মদত দিয়ে কি সব ভেড়ি দখল করতে এসেছিল, বলি আমি কি নেই? না মরে গেছি? খবর দাওনি কেন?

কামিনী এই বিপদে আজ বেই মশাইকে এগিয়ে আসতে দেখে আশান্বিত হয়ে বলে।

—আপনি এবার ওদের পাশে দাঁড়ান। ভোলাকে তো পুলিশ এ্যারেষ্ট করতে এসেছিল।

শিবু মাষ্টার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভরে বলে।

—পুলিশ এ্যারেষ্ট করবে? এমমিই। কোন ভয় নেই বাবাজী, দরকার হয় দু'দশ দিন থেকে এসবের ফয়সালা করেই যাবো। দেখছি ওই কেশব ঘুঘুকে।

অর্থাৎ বিশ্বাস মশাই দেহ রাখার পর এবার তার বুকে শিবু মাষ্টারও এসে হাজির হয়েছে এদের বাড়ীতে।

এতদিন ধরে শিবু মাষ্টার শুধু দৃষ্টি রেখেছিল মাত্র, আর জামাইয়ের এখানে হানা দিতে পারেনি, কিন্তু এখন বিশ্বাস মশাই নেই, সুতরাং এসেছে।

কামিনী এত শত বোঝে না।

বরং শিবু মাষ্টারকে আসতে দেখে খুশী হয়েছে সে।

কিন্তু খুশী হয় নি লক্ষ্মী, কেন জানে না বাবার এখানে আসাটা তার চোখে ভালো ঠেকেনি। বলে লক্ষ্মী বাবাকে।

—তুমি কেন এসবের মধ্যে এলে বাবা?

বিষ্টুর ঘরে বসে শিবু নস্কর মনোযোগ দিয়ে কিছু কাগজ পত্র, হিসাব, কোর্টের চিঠি, রিটার্ন দেখছিল।

চোখে নিকেলের চশমা, শীর্ণ পাকানো দেহের তুলনায় নাকটাকে প্রকট বলেই মনে হয়। শিবু মাষ্টার বলে মেয়ের কথায়।

—আসবো না? তোদের ভরাডুবি করে দেবে পাঁচজনে তাই দেখবো?

লক্ষ্মী বলে—কিন্তু পাঁচজনে কি বলবে তা জানো?

শিবু বলে—

রাখতো ওসব কথা। অ বিষ্টু! তোমার রিটার্ন গদীর হিসাব পত্র এসবে তো ঢের গোলমাল দেখছি হে।

বিষ্টু জানায়—

—ওসব তো বৃন্দাবন সরকার মশাই দেখে, পুরোনো লোক। আর ভোলানাথও গদিতে বসে।

শিবু মাষ্টার বলে—পথে বসাবে এইবার হে।

নাহ। দেখছি আমাকেই সব দেখতে হবে। বুঝলে বাবাজী, কাঁচা পয়সার ব্যাপার। নিজে পড়ে থাকো ভেড়িতে এদিকে ক্যাশ কড়ি সে হরির লুট চলেছে। তারপর কেষ্টর ওই ধাক্কা।

শিবু মাষ্টারকে গদিতে আসতে দেখেই ভোলানাথ একটু অবাক হয়।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। সারা এলাকায় ভেড়ির মাছ বাঁকবন্দী হয়ে না হয় জিপে করে এসে কাঁটায় পৌঁছচ্ছে, বড় রাস্তার এদিক ওদিকে এসে হাজির হয়েছে কলকাতা, ব্যারাকপুর, নৈহাটি ওদিকে বজবজ, বাটানগরের মাছ এর পাইকেররা।

টাল বন্দী মাছ সাইজ হিসাবে গাদা করা হচ্ছে, বৃন্দাবন সরকার বাজার বুঝে দর লাগাবে।

নীলামে তুলেছে এক একটা লট, বাজার বুঝে দর উঠা নামা করে।

শিবু মাষ্টার বলে—সরকার, চড়িয়ে দর ধরো।

ভোলানাথ বলে—

বাজারে বহু মাছ এসেছে, আজ দর বেশী চড়ানো যাবে না। মাল আটকে যাবে, নায্য দরই ধরো সরকার কাকা।

বৃন্দাবন সরকারও সেই মত দর ধরে।

বাজারের বিভিন্ন কাঁটার মধ্যে ভোলানাথের কাঁটার মালই আগে উঠে যায়।

শিবু মাষ্টার তাকে অগ্রাহ্য করতে দেখে আদৌ খুশী হয় নি?

মালপত্র শেষ করে গদিতে হিসাব লিখতে বসবে বৃন্দাবন। সরকার দেখে তার আগেই শিবু মাষ্টার গদিতে খাতাপত্র নিয়ে বসেছে।

বাইরের লোককে এসব দেখানো যায় না। তাই বৃন্দাবন পুরোনো লোক। সে বলে—মাষ্টার মশাই, ওসব খাতাপত্র থাক। নাইবা দেখলেন—

শিবু বলে—থাকবে কেন? তোমাদের কাজ কোম্মোর নমুনা তো দেখলাম। বাজারে দু টাকা দর চাপালে নিদেন হাজার টাকা বেশী আমদানী হোতো—

ভোলানাথ বলে—মাল আটকে গেলে ক ত হাজার ডুবতো?

শিবু মাষ্টার শোনায়—আটকাবে কেন? এই কম দরের নামে মহাজনদের কাছে কত দস্তুরি পেলে হে সরকার?

বৃন্দাবন এখানে এতকাল চাকরী করে এসব কথা শোনেনি অপমান-জনক কথাই। বৃন্দাবন বলে রাগ চেপে।

—সে কৈফিয়ৎ বিষ্টুবাবু চাইলে দেব।

শিবু মাষ্টার চটে ওঠে। বলে সে,

—আমি চাইছি।

ভোলানাথ এমনিতে শান্তশিষ্ট ছেলেই।

বেশী কথা বলে না।

তবে জানে সে বৃন্দাবন কাকাকে। নিরীহ ভালোমানুষই অসৎ উপায়ে সে রোজগার করে না।

শিবু মাষ্টারকে ভোলানাথ আগে থেকেই চেনে। ওর দলবল দিয়ে

বাইরে ভেড়ি লুট করার ব্যাপারটাও জানে।

তাই ওর এখানে আসাটাকে পছন্দ করেনি ভোলানাথ। আজ উড়ে এসে জুড়ে বসে এই ভাবে বৃন্দাবন কাকাকে অপমান করতে দেখে ভোলানাথের মাথায় রক্ত উঠে যায়।

গদি ঘরের মুহুরী, অন্য কর্মচারীদের সামনে শিবু মাষ্টার ইচ্ছা করেই বৃন্দাবনকে এসব কথা বলেছে নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েম করার জন্য।

ভোলানাথ দেখছে বৃন্দাবন কাকার অসহায় চেহারাটা।

বৃন্দাবন বলে কি বলছেন মাষ্টার মশায়? ছোটবাবু ও রয়েছেন এবার শত্রুপক্ষকে কোনঠাসা করে বিজয়ীর ভঙ্গীতে বলে শিবু মাষ্টার।

ঠিকই বলছি। আর ছোটবাবুকে কিঞ্চিৎ দিলেই সে গোড়ে গোড় দেবে। কই দেখি জমাবন্দীর খাতাটা।

ভোলানাথ ওসব দেখে।

এবার বলে সে—ওটা আমি দেখি, আপনাকে দেখাবার কথা তো নেই। আর গদির কাজে এসময় এখানে না এলেই ভালো হয়। আপনি বাড়িতে যান। এখানে কোন আজ আপনার নেই।

শিবু মাষ্টার যেন গালে সপাটে চড় খেয়েছে। একটু বেশি বাড়াবাড়িই করেছে। আর ধূর্ত লোকটা রাগলেও সেটা প্রকাশ করে না। বরং ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্যই বলে।

—আরে রাগছো কেন বাবাজী! ব্যবসার ব্যাপার একটু দেখে সমঝে চলতে হয় তাই বলছিলাম। ঠিক আছে।

শিবু মাষ্টার বেগতিক দেখে আপাততঃ শিবু হটে গেল। কিন্তু মনে মনে সে চটেছে খুবই। কি করে জবাব দিতে হয় তা সে দেখিয়ে দেবে।

ভোলানাথ কাজের পর ভেড়ির দিকে যাচ্ছে জিপটা নিয়ে। কাল লগণসার বাজার, ভালো অর্ডার আছে। তাই বড় সাইজের রাখা মাছ আছে একটা বিশেষ ভেড়িতে, সেখানেই মাছ তুলতে হবে।

...পথে গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হতে দাঁড়ালো। কি রে?

গোবিন্দ ওর সঙ্গেই পড়তো, গোবিন্দদের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

ওর বাবা মারা যাবার পর ওদের সংসার অবলহয়ে পড়ে তখন গোবিন্দ স্কুলে পড়ছে, লেখাপড়াতে ভালোই সে, কিন্তু সেদিন গোবিন্দের পড়াশোনাও বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

পরীক্ষা দেবার টাকাও নেই। সেদিন ভোলানাথই ওর পাশে দাঁড়ায়। বলে সে ওসব ব্যবস্থা হয়ে হাবে তুই পড়বি গোবিন্দ।

ওদের বাড়িও যায় মাঝে মাঝে ভোলানাথ।

গোবিন্দ এখন ভোলানাথের সাহায্যেই পাশ করে এদিকেই কোন বি-ডি-ওর অপিসের কেরানীর চাকরি করছে।

গোবিন্দ বলে—এই রোদে চল্লি কোথায়? চল—বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাবি।

সময় নেই ভোলানাথের। তবু পুরোনো বন্ধুর ডাকও এড়াতে পারে না। তাই যেতেও হয়। গোবিন্দর মাও খুশী হয়।

—এসো বাবা। এদিকে আসোই না।

গোবিন্দ বলে—আসবে কি? এখন তো গদিমালিক, মহাজন বলে ভোলানাথ—

সময় পাইনা মাসীমা, বাবা মারা যাবার পর এখন কাজে বের হতে হচ্ছে।

গোবিন্দের বোন মাধবী বলে— অর্থাৎ খেটে খেতে হচ্ছে। কি বলো ভোলাদা?

মাধবী এখন পাশ করে এখানের স্কুলেই চাকরী করছে। বেশ ছিমছাম গড়ন আর বুদ্ধিমতীও। মাধবী বলে—

—স্কুলের মিটিং-এ দেখলাম সেদিন তোমার দাদাকে। ভোলানাথও জানে গ্রামের এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল তার বাবা। বিভূতি বিশ্বাসই জমি, টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল।

ভোলানাথ বলে—দাদা যায় মাঝে মাঝে,

—আর তুমি ওদিকে হাঁটো না? মাধবী হাসছে।

ভোলানাথ বলে—ওসব স্কুল ফিস্কুলে আর কাজ নাই।

তা গোবিন্দ, এবার বিয়ে থা কর ?

হাসছে মাধবী, বলে সে—

এসেই বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার মত হ'ল যে। নিজের খাবার ইচ্ছা, তবু বলবে ওর পাতে বেশী করে দাও।

হাসছে গোবিন্দ—ঠিক বলেছিস ? তা ভোলা তুইই এবার বিয়ে থা কর। আমার যা রোজকার তাতে বৌ পোষা যাবে না। তাছাড়া বোনের বিয়ে থাও দিতে পারছি না—

ভোলানাথ বলে—মাধবী তো এবার ভালোই মাইনে পাচ্ছে।

মাধবী বলে—তবু এতে স্বামী পোষা যাবে না। তার চেয়ে বিয়েটা তুমিই বাপু আগে করো। বলো না হয় মাসীমাকে বৌদিকে গে বলি এবার দেওরটির বিয়ে থা দাও।

হাসে ভোলানাথ। বলে সে—

—আর বিয়েতে কাজ নেই। মেজবাবু বিয়ে করে যা খেল।

মাধবী চা নামিয়ে দিয়ে বলে—সবাই তা নয় ভোলাদা।

ভোলানাথ দেখছে মাধবীকে।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে মাধবীকে। সেই শ্যামল শান্ত মেয়েটি হঠাৎ যেন বদলে গেছে। ওর ডাগর চোখের চাহনিতে কি স্নিগ্ধতার আহ্বান, দেহে এসেছে যৌবনের পূর্ণতা।

বাধবী হঠাৎ বদলে গেছে। এ যেন রুক্ষ প্রান্তরে কোথায় একটু শ্যাম ছায়ার স্নিগ্ধতা জাগে।

মাধবী বলে—স্কুলে যেতে হবে। দেরী হয়ে গেছে।

ভোলানাথও যাবে ওই দিকেই। বলে সে—চলো, নামিয়ে দিয়ে যাই। আর গোবিন্দ, বিকালে ক্লাবে আসবি। কি সব অনুষ্ঠান এর তোড়জোড় চলছে।

গোবিন্দ বলে, যাবো।

শিবু মাষ্টারের বন্ধু নবীন সরকার এখন এখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার। এককালে নবীনবাবু বিভূতি বিশ্বাসের খুবই অনু-

গত ছিল, তাই বিভূতিবাবু স্কুল তৈরী করার সময় তাকেই রেখেছিল এখানে।

ক্রমশঃ নবীন সরকারের শিকড় গজিয়েছে, এখানে সে এমন কায়েম হয়েছে। আর দেখেছে চাকরী বজায় রাখতে গেলে যেদিকে বেশী হাওয়া সেই দিকেই ভিড়তে হবে।

তাতে চাকরীও বজায় থাকবে।

আর এখন সেইটারই দরকার।

নবীন সরকার এখন অনায়াসে ভিড়েছে। শিবু মাষ্টার মাষ্টারী থেকে অবসর নিয়ে এখন সেই দলেরই মাতব্বর।

ফলে নবীন সরকারের খুব প্রিয়জনই শিবুও।

শিবু মাষ্টার সকালে গদিঘরের লোকজনদের সামনে ভোলানাথের অপমানটা ভোলে নি। তাকে গদিঘর থেকে বেরই করে দিয়েছিল।

শিবু মাষ্টার এসে হাজির হয়েছে নবীন সরকারের এখানে। স্কুলের কাছেই নবীন সরকার এখন পাকা বাড়ি তুলেছে, অবশ্য দুষ্টু লোকে বলে স্কুলের বিল্‌ডিং হবার সময় নবীনের বাড়ীটাও হয়েছিল, আর তার বাড়ীর গ্রিল লাগানো দোতলাটা হয়েছিল স্কুল বিল্‌ডিং তিনতলা হবার সময়।

নবীনবাবু শিবু মাষ্টারকে খাতির করে বসিয়ে চা দিয়েছে। নবীন জানে শিবু মাষ্টার এখন এখানেই তাঁবু গড়বে। বিভূতি বিশ্বাস এর প্রভূত সম্পত্তির পরিচালনা ভার আসছে তার হাতেই।

ফলে ওকে খাতির করা দরকার। কিন্তু মাষ্টার বলে—

তাহলে কাজকর্ম ভালোই চলছে নবীন। তবে দলের আনুগত্য মেনে চলে দেখবে কোন অসুবিধাই হবে না।

নবীন তা জানে, আর মানেও।

হঠাৎ চোখ পড়ে শিবুর ওই ভোলানাথের জিপটাকে দেখে। স্কুল শুরু হয়ে গেছে। সকালে মেয়েদের বিভাগ।

হঠাৎ ভোলার জিপ থেকে মেয়েটিকে হাসিমুখে নামতে দেখে শিবুর

উর্বর মস্তিষ্কে ব্যাপারটা গজিয়ে ওঠে।

শুধোয় সে—কে হে নবীন, মেয়েটি ?

—এখানের শিক্ষিকা। মাধবী ঘোষ।

শিবু মাষ্টার বলে—

তা বেশ তো জমেছে দেখছি। দুজনে? তা জমুক। এই তো জমার বয়স। কিন্তু তাই বলে স্কুলে আসবে যখন খুশী তখন? তুমি প্রধান শিক্ষক হয়ে এসব দেখবে? রাসলীলা চলবে স্কুলে?

নবীন সরকারের কর্তব্য জ্ঞান টনটনে হয়ে ওঠে।

বলে সে—তাইতো। দেখছি এবার। আর ওই ভোলাটাও এক নম্বর গুণ্ডা। পয়সাও আছে।

শিবু যেন কিছুই জানে না। বলে সে—তাই নাকি ?

নবীন সরকাররা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতেই দলের আনুগত্য মেনে চলে। দলের ভালো মন্দ নয়, নিজেদের ভালো-মন্দের জন্যই দল বাঁধে তারা।

ভোলানাথও কমিটি মেম্বার, আর মিটিং-এ নবীন সরকারের হঠাৎ পয়সা আসার ব্যাপার নিয়েও বেশী তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করেছে।

নবীন জানে ভোলানাথ এর দলবলও আছে, বেশ কিছু তরুণ ওর অন্ধ ভক্ত। এই নিয়ে নবীনকেও বিপদে পড়তে হয়েছে। তাই আজ শিবু মাষ্টারের কথায় বলে নবীন।

—ওটা একেবারে বিরুদ্ধ দলের লোক শিবুদা, আমাদের দেখতে পারে না। ওর দলবলও আছে, তাই ভয়ে বলতেও পারিনা কিছু।

শিবু অভয় দেয়—তাই বলে ডিসিপ্লিন মানবে না ?

দরকার হয় মেয়েটির এগেনষ্টে ষ্টেপ নাও।

নবীন ভয়ে ভয়ে বলে—ভোলানাথ যদি কিছু করে।

শিবু অভয় দেয়—সে দেখা যাবে।

অর্থাৎ শিবু মাষ্টার এবার দাবার ছকে হিসাব করেই চাল দিতে শুরু করেছে। এরপর সেও দেখে নেবে।

বিষ্টুর কানে কথাটা তুলেছে গদিঘরের ভুতো পাল।

ভুতো পাল এমনিতে নোংরা স্বভাবের লোক। বাজারে একটা মেয়েছেলেও আছে তার। গদি ঘরে আড়তে দু-দশ টাকা হাতসাফাই করে যখন তখন।

বৃন্দাবন সরকার তাকে দেখতে পারে না।

ভুতো চেয়েছিল শিবু মাষ্টারের দলে ভিড়ে দু' একটা ভেড়ি লুট করে কিছু বখরাও পেয়েছে।

সে শিবুরই লোক।

শিবু মাষ্টারের অপমানটা তার গায়ে লাগে, তাই গিয়ে বড়বাবুকে খবরটাও দেয়।

বিষ্টু অবাক হয়—সেকি। অপমান করলো ভোলাবাবু গুরুজনকে?

ভুতো বলে—এর মানে ওই বেন্দা সরকার। ওর যে অসুবিধা হবে মাষ্টারবাবু বললে।

বিষ্টু গুম হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরছে দুপুরে। ভোলা তখনও ফেরেনি।

শিবু মাষ্টার এর মধ্যে স্নান আহার করে পর বাড়িতে কত্তার গড়গড়াটায় তামাক সাজিয়ে মৌজ করে কত্তা সেজে বসেছে।

লক্ষ্মী সেটা দেখে বলে—নকু।

নকুল এ বাড়ির কাজের লোক। লক্ষ্মীর ডাকে ছুটে আসতে লক্ষ্মী বলে।

—কত্তাবাবুর গড়গড়াটা কেন বের করেছিস?

শিবু মাষ্টার মেয়ের কথায় বলে—

আমি বলেছি, পড়েই ছিল ওটা।

লক্ষ্মী বলে—নকু। ওটা ধুয়ে তুলে রাখবি। হুকো আছে ওতেই ওঁকে তামাক সেজে দিবি।

অর্থাৎ তার মেয়েও বাবাকে কত্তা সাজাতে আদৌ রাজী নয়।

ভোলানাথ ঘরে ঢুকে বৌদির ওই নির্দেশ শুনে চাইল। বাবার

গড়গড়াটা ওর হাতে বেমানান' তাই ভোলা বলে—

ঠিক করেছে বৌদি। উনি একটু দ্রুত বেড়ে চলেছেন'।

শিবু চাইল। লক্ষ্মী বলে—তুমি স্নান করে নাওগে ঠাকুরপো।

লক্ষ্মী ভোলানাথ এর সঙ্গে বাবার গদিঘরের গোলমালের খবরও শুনেছে তাই বাবাকেই এবার বলে সে।

—আজ সকালে গদিতে কেন গেছলে বাবা;

শিবু মাষ্টার এর চোখ সব দিকেই। কদিন এ বাড়িতে থেকে সে এখানের মানুষজন, তাদের হাবভাব সবই দেখেছে।

তার মেয়ে যে ওই ভোলানাথকে একটু বেশী স্নেহ করে তাও জানে। শিবু মাষ্টার বলে

—কেন যাবো না? একা বিবু সামলাতে পারছে না।

—এদিকে কেষ্টও মামলা করতে চায়, পার্টিশান এর মামলা। আর সরকারকে হাতে করে ভোলানাথ তার আখের উচিয়ে নিচ্ছে, তাই—

লক্ষ্মী বাবার এইসব কথা শুনে একটু অবাক হয়।

লোকটা চিরকালই বাঁকা কথা বলে, বাঁকা পথে চলে। আর ভোলানাথ এর সম্বন্ধে এসব কথা আদৌ বিশ্বাস করে না লক্ষ্মী তাই বসে সে,

—এদের ব্যাপার এদেরই সামলাতে দাও বাবা। ভাই ভাই-এর ঝামেলার মধ্যে তুমি থেকো না।

শিবু মাষ্টার বলে—থাকতে তো চাইনি। কিন্তু কেষ্ট আর ভোলানাথ দুটোই সমান। ভোলাও তো দেখি একটি মেয়েকে নিয়ে ঘোরে টোরে। একটু বাড়াবাড়িই করে ওই যে মাধবী ঘোষ তার সঙ্গে। পাঁচজনে পাঁচকথাও বলছে।

অবাক হয় লক্ষ্মী।

মাধবীকে সেও চেনে। এ বাড়িতে আসে মাধবী।

ভোলানাথ তাদের অনেক করেছে, কিন্তু দুজনের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক আছে তা ভাবেনি। ভাবতেও পারে না।

তার বাবা ক'দিনের মধ্যে এ বাড়িতে শিকড় গেড়ে বসে যা করার চেষ্টা করছে সেটা যে এমনি বিকৃত একটা ব্যাপার তা বুঝেছে লক্ষ্মী।

শিবু মাষ্টার বলে তাক বুঝে।

—বাবা মারা যাবার পর এ বাড়িতে অসবর্ণ বিয়েও হবে তা ভাবিনি। দেখবি সবাই কেটে পড়বে যার যা নিয়ে, বিপদে পড়বি তুই। বিষ্টুকেও বলতে হবে কথাটা। এই যে বাবাজী—

বিষ্টুকে আসতে দেখে খুশী হয় শিবু মাষ্টার। বিষ্টুও খবরটা শুনেছে আগেই। শিবু মাষ্টার বলে,

—এবার সাবধান হও বাবাজী। ঘরে বাইরে শত্রু, ভাই যদি পিছনে লাগে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই বলছি কেষ্ট য্যামন বাইরে গেছে ভোলানাথকেও তারটা বুঝিয়ে বাইরে করে দাও, না হলে বিপদই হবে। শুনেছোতো গদিঘরের ব্যাপার? ক্যাসে গড়বড়।

বিষ্টুও বলে,

—ভোলা ওসব করে তা জানি। ওর স্বভাবই এমনি।

শিবু মাষ্টার বলে—হবে না? মেয়ে ছেলের পাল্লাতে ও পড়েছে যে।

লক্ষ্মী এবার বলে কঠিন স্বরে—

তুমি থামবে বাবা? যা জানো না তা নিয়ে কথা না বল্লেই ভালো করবে। আর এ বাড়িতে না থাকলেই ভাল।

লক্ষ্মী রেগে উঠেছে।

বিষ্টু ভাবছে কথাটা।

শিবু মাষ্টার বলে—তাহলে এসব কথা থাক বাবাজী। তোমরা আমার সাহায্য চাও না, তখন এসব আর কেন?

বিষ্টু বলে ওঠে লক্ষ্মীকে,

—তুমি যাও তো। এসবের মধ্যে থেকো না। বাবা ঠিকই বলেছেন আজ সবাই আমাকেই ফাদে ফেলতে চায়।

লক্ষ্মী চলে গেল রেগে মেগে।

বিষ্টু বলে শিবুকে—আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি এখন আমার অভিভাবক। যা ভালো বোঝেন করুন।

শিবু মাষ্টার কি ভাবছে।

জানে সে বিষ্টু তার হাতেই আছে। তবে মেয়েকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

শিবু বলে—এখন স্নান খাওয়া করে নাও বাবাজী বিকালে বসা যাবে।

শিবু ভেবেই রেখেছিল। এবার বলে সে বিষ্টুকে ঠাণ্ডা মাথায় ওই তিন নম্বর ভেড়ি তোমার নামে, শুধু এক নম্বর ভেড়ির মালিকানা তিন ভাইএর। তুমি দু-নম্বর তিন নম্বর ভেড়ি দুটো থেকে ওদের হঠিয়ে দাও। ভোলানাথকে বলো সে গদিতে ধসবে মাস মাইনে পাবে।

শ্বশুরের কথাগুলো ভাবছে বিষ্টু।

বিষয় সম্পত্তির লোভটা মানুষকে বদলে দেয়। বিষ্টুও দেখেছে একটু কৌশল করলেই এসবই তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে এই চিন্তাটা ধীরে ধীরে তার মাথাতে বেশ কায়েম হয়েই বসে যায়।

শিবু মাষ্টার দেখছে তার শিখানো বিদ্যাটা কতখানি বিষ্টুনিতে পেরেছে' বিষ্টু বলে

—কোন গোলমাল হবে না তো?

শিবু মাষ্টার বলে—এক আধটু হবে না তা নয়। তবে বাবাজী বিষয়পত্র রাখতে গেলে এসব হবে। আর যদি তো আছি তাই, বলছি, দুটো ভেড়ি বিচে—ক্যাস হাতিয়ে নাও।

বিষ্টু কি ভাবছে,

লক্ষ্মী জানে তার বাবাকে। এবার তাই সেও সাবধান হয়েছে। বাইরে থেকে বাবার ওই পরামর্শ শুনে লক্ষ্মী ভিতরে এসে পড়ে। ওকে দেখে বিষ্টুও ঘাবড়ে যায়।

লক্ষ্মী বলে—এসব পথে যেওনা। ছোট ভাইকেও পথে বসাতে

চাও। মাকেও ?

বিষ্টু স্ত্রীকে একটু সমীহ করে। দেখছে এ বাড়ির সর্বময় কর্ত্রীর আসন এখন মা ওকেই ছেড়ে দিয়েছে। লক্ষ্মী বলে।

—সৎপথে থেকে লড়ে যাবে। তাছে বিগয় থাকে থাকবে যাবার হলে যাবে। যে টুকু থাকবে তাইতেই চলে যাবে। তবু ওসব ঠকাবার কথা ভাববে না। বাবা, এসব পরামর্শ দিওনা।

চুপ করে যায় শিবু মাষ্টার। বেশ বুঝেছে এখানে সুবিধা হবে না।

ভেবেছিল গদিতে বসে কিছু ম্যানেজ করবে, ভেড়ি দুটো বিক্রী করাতে পারলে তার হাতে নগদ ও লাখ দেড়েক টাকা আসতো আর গুপী বিশ্বাস তো কেনার জন্য তৈরী হয়ে আছে, তাকে ম্যানেজারও রাখতো।

কিন্তু এখানে তায় মেয়েই বাদ সেধেছে।

শিবু তাই নিজে থেকেই সরে এসেছে।

ভোলানাথ ভাবতে পারেনি তার বৌদি নিজে তার লোভী পিতৃদেবকে সরিয়েছে। বলে ভোলানাথ বৌদিকে।

—এ কি করলে বৌদি ? তোমার বুদ্ধিমান বাবা এলেন সাহায্য করতে, তাকে কিনা বিদেয় করে দিলে এ ভাবে ?

লক্ষ্মী বলে—সে যা করার করেছি। এবার তোমাকেও বলি বিয়ে থা করে নিজের বিষয় আশয় বুঝে নাও। আমি আর এসব বোঝা বইতে পারবো না

ভোলানাথ দেখছে ওকে। বলে সে

—আমি তোমার এতবড় বোঝা হয়েছি বৌদি ?

লক্ষ্মী জবাব দেয়,

—ওই মাধবীকে নিয়ে কেন আমায় কথা শুনতে হবে ?

চুপ করে যায় ভোলানাথ।

ভাবতে পারেনি—বৌদিও এই কথা বলবে। মাধবীর কথা ভেবেছে ভোলানাথও। কিন্তু গ্রামে এখনও সমাজ এর গোঁড়ামি কিছুটা রয়ে গেছে। ভোলানাথ বিয়ের কথা মাধবীকে ও বলেছিল।

—কেন ?

মাধবী সেদিন কোন জবাব দেয় নি।

মেয়ে হয়ে সেও বোঝে ব্যাপারটা। বলে সে।

—এ হতে পারে না ভোলাদা।

—আমরা তোমাদের স্বজাতি নই। গ্রামে এতবড় কাজটা ঠিক চলবে না। তাতে অশান্তিই বাড়বে। তোমার মা, দাদা বৌদি ওরাও এতে মত দেবেন না।

ভোলানাথ গোঁয়ার প্রকৃতিরই। এতকাল যা কিছু পেয়েছে তাতে জোর করেই তার দাবী সাব্যস্ত করতে হয়েছে।

ভোলানাথ বলে—কেন দেবে না ? না দেয়, তবুও বিয়ে হবে।

মাধবী দেখছে ওকে।

বলে সে,

—এসব কথা ভেবে লাভ কি ভোলাদা, আমিও ব্যারাকপুরে চাকরী নিয়ে চলে যাচ্ছি, দূরে গেলেই এসব মুছে যাবে মন থেকে।

ভোলানাথ গুম হয়ে ফেরে।

এ যেন তার বিরুদ্ধে সব কেড়ে নেবারই চক্রান্ত চলেছে। বাড়ি ফেরে ভোলানাথ।

বৌদি জেরা করে কোথায় ছিলে ?

জবাব দিল না ভোলানাথ।

গুম হয়ে দোতালায় নিজের ঘরে চলে গেল। কামিনী দেখছে ছেলেকে। শুধোয় সে।

—জবাব দিচ্ছিস না কেন ?

মায়ের কথায় বলে ভোলানাথ—আমার ইচ্ছা।

মা ফুঁসে ওঠে—যা ইচ্ছা তাই করবি নাকি ? এ বাড়িতে অজাতের

মেয়েকে এনে তুলবি তাই মেনে নিতে হবে ?

—মা। ভোলানাথের দু চোখ জ্বলে ওঠে।

কি বলতে যাবে। লক্ষ্মীই শোনায়,

—উপরে যাও ঠাকুরপো। মায়ের শরীর ভালো নেই। চেঁচামেচি করো না এখন। যাও—

ভোলানাথ বৌদির কথার অমান্য করতে পারে না।

কি যেন ব্যক্তিত্ব আছে ওই মেয়েটির মধ্যে যাকে বেপরোয়া ভোলানাথও অস্বীকার করতে পারে না। তাই সরে গেল।

কামিনী বলে—আমার হয়েছে মরণ। একজন মামলা লড়ছে, আর একজন ঘরে বসে দাপাচ্ছে। কত্তা যাবার আগে আমি কেন গেলাম না।

লক্ষ্মীও কথাটা ভেবেছে।

দুপুরে ভোলানাথ খেতে আসেনি। লক্ষ্মী ওর ঘরে গিয়ে দেখে ভোলানাথ গুম হয়ে বসে আছে। চানও করেনি। লক্ষ্মীকে দেখে চাইল।

—যাবে না ?

ভোলানাথ বলে—খিদে নেই।

লক্ষ্মী কাছে এসে বলে—মা দুঃখ পাবে। স্নান করে খেতে চলো।

—না।

লক্ষ্মী বলে—ঠিক আছে। উপোস দেওয়া আমার অভ্যাস আছে। খেও না।

—তুমি খাবে না কেন ? ভোলানাথের প্রশ্নে লক্ষ্মী বলে,

—একজন খাবে না এ বাড়ির কত্তা, আমি তো দাসী বাঁদী বইতো নই, খাই কি করে ?

ভোলানাথ উঠে বসলো। জানে সে বৌদিকে। না খেয়েই থাকবে সে। তাই ভোলনাথ বলে,

—চলো।

লক্ষ্মী কাছে এসে বলে—

মিছে আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। সব বুঝি। মাধবীকে আমিও ভালোবাসি। ভালো মেয়ে। কিন্তু কিছু সমস্যা থাকে যার সমাধান আমাদের হাতের বাইরে—

ভোলানাথ দেখছে বৌদিকে।

ও তার মনের কথাটাই বুঝেছে।

—কিন্তু দিনতো বদলাচ্ছে—

হঠাৎ নীচে বৃন্দাবন সরকার এর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, কিছু লোকের চীৎকার, বিষ্টু বাবুর চীৎকার শুনে সচকিত হয়ে ওঠে ওরা।

বিষ্টুবাবু লোকজন নিয়ে হাতিয়ার পত্র নিয়ে বের হয়ে গেল। লক্ষ্মী ছুটে আসে, পিছনে এসেছে ভোলানাথও।—কি ব্যাপার?

বৃন্দাবন সরকার বলে—সব্বোনাশ হয়েছে মা, কারা ভেড়ি লুট করতে এসেছে, দুনম্বর ভেড়ি। হাতিয়ার পত্র নিয়ে এসেছে। আমাদের লোকজনও তৈরী।

লক্ষ্মী জানে ভেড়ি লুট ওর লড়াই সাংঘাতিকই হয়। রক্তপাত ও ঘটে, আর সেই বিপদের মাঝে তার স্বামীকে ছুটে যেতে দেখে ভয় পেয়েছে সে। বলে—বড়বাবুকে এর মধ্যে কেন যেতে দিলেন?

কামিনীও এসে পড়েছে। ওর দুচোখে আতঙ্কের ছায়া—কিহবে মা?

হঠাৎ দেখা যায় ভোলানাথকে তার বাহন পতিতও এসে জুটেছে। ভোলানাথের হাতে বন্দুক, দুচোখে কি জ্বালাভরা চাউনি, পতিতের হাতে সড়কী।

চমকে ওঠে লক্ষ্মী—কোথায় চল্লে?

ভোলানাথ জিপটা বের করেছে।

বৌদির কথায় ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে গলা তুলে বলে,

দাদা গেছে, কোন শালারা কি করছে দেখে আসছি বৌদি।

বের হয়ে গেল সে এক ঝলক পেট্রলের ধোঁয়া ছেড়ে।

কামিনী হাহাকার করে—ওরে সব যায় যাক্, তোরা যাস্‌নে ? ও সরকার।

বৃন্দাবনও এবার ভরসা পেয়ে বাকী লোকজনদের জমায়েত করে পাড়ে।

—তোরা দেখছিস কি ? চল সবাই—

উন্মাদ কলরব করে এরাও ছুটে চল্লো ভেড়ির দিকে।

কেশব ঘুঘু এতদিন ধরে তাক খুঁজছিল। কেষ্টবাবুকে দিয়ে মামলা করিয়ে এ্যারেষ্ট করাতে চেয়েছিল ভোলানাথকে। ভয় ওকেই। কিন্তু পারেনি।

মামলা চলছে সিভিল স্যুট। পার্টিশান এর মামলা। তাতে হবে না।

এহেন সময় কেশব ঘুঘু শিবু মাষ্টারকে আসতে দেখে সেদিন অবাক হয়।

কেষ্টর কাছেই যেন শিবু মাষ্টার এসেছে।

শিবু মাষ্টার দেখেছে তার ওই বিষ্টুবাবাজীর বাড়িতে বসে দাবার চাল চালা হবে না। কিছু আমদানীও হবে না। নিজের মেয়ে আর ওই কঠিন ভোলানাথ পদে পদে বাধা দিয়েছে, ভোলানাথও শাসিয়েছিল মানে মানে এ বাড়ি থেকে না গেলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব ঠ্যাং ভেঙ্গে দোব।

শিবু মাষ্টার তারপর আর থাকতে সাহস করেনি।

বের হয়ে এসেছিল।

কিন্তু মনে তার রাগটা ছিলই। তবু বাইরে তার প্রকাশ ছিল না।

এরপরও যেন কেষ্টর বাসায় এসেছে তাদের হিতৈষী হয়েই।

কেষ্ট বলে—আসুন, কি ব্যাপার ?

শিবু মাষ্টার বলে—এলাম বাবাজী, ভাই এ ভাই এ এসব মামলা মিটিয়ে নাও' বলোতো আমরা পক্ষজন থেকে এর মামাংসা করি।

কেষ্ট ও এবার বুঝেছে মামলায় কিছু হবে না।

খরচান্তই হচ্ছে, তার ও টাকার দরকার। কিছু মোটা টাকা থোক পেলে সে ভেড়ির সত্ব ছেড়ে দেবে।

তাই কেষ্ট বলে-বেশতো চলুন একদিন বসা যাক। আমিও এসব চাই না।

বের হয়ে আসছে শিবু মাষ্টার হাওয়া বুঝে।

বাইরের ঘরে কেশবের ডাক শুনে চাইল। কেশবও চেনে শিবুদাকে।

বলে সে—এসব কি হচ্ছে শিবুদা? মিটমাট হয়ে গেলে আমাদের অবস্থা কি হবে? অবশ্য তোমার জামাই কিছু দেবে, কিন্তু তাতে কি পাবে—তার চেয়ে।

শিবু দেখছে কেশবকে।

শিবু মাষ্টারও গোলমাল নিইয়ে রাখতে চায়। তবু প্রকাশ্যে বলে —তার চেয়ে কি করতে বলোহে কেশব?

কেশবই পরামর্শটা দেয়।

শিবু মাষ্টারের লোকবল আছে, কেশবের আছে আসলি বুদ্ধি। দুজনে এক হলে এই বিভূতি বিশ্বাসের পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যে ঘুঘু চরাতে পারবে তার।

কেশব ঘুঘুর মতলব ও সিদ্ধ হবে।

শিবু বলে—কিন্তু গোলমাল হলে তখন?

কেশব বলে—কি হবে তা জানো তুমিও। আর এই মৌকায় ওই ছোটবাবু ভোলাকে যদি জম্পেশ করে জড়িয়ে জেলে পুরতে পারো ব্যাস। তাহলে তখন তুমিই সর্বেসর্বা হবে।

এদিকে আমিও কিছু পাই।

শিবু মাষ্টার ভাবছে কথাটা। বসে সে—খুব ঝকমারির কাজ হে' কেউ টের পেলে কিন্তু মুস্কিল হয়ে যাবে। কেশবঘুঘু ক্রমশঃ এবার এতবড় খেলোয়াড়কে হাতে আনতে পেরে মনে মনে খুশীই হয়। বলে সে—

—না, না। শুধু তুমি শিবুদা যোগাযোগ গুলো করিয়ে দাও, তুমি থাকবে আড়ালে, সামনা সামনি যা করার আমিই করবো। কাক-পক্ষীতেও জানবেনা। শুধু বখরাটা ঠিক পেয়ে যাবে।

শিবু মাষ্টার সেটাও হিসেব করে ঠিক করে নিয়ে এবাব অন্তরাল থেকে কলকাঠি নেড়েছে।

এতবড় সোনার খনি লুট করার লোকের অভাব হয় না। কেশব ঘুঘুও বেশ জানে ব্যাপারটা ভাই ভাই এর বিবাদের ফলশ্রুতি হিসাবেই চলে যাবে বেমালুম। তাদের হাতে আসবে মোটা টাকা।

শিবু মাষ্টারও বুঝেছে চারিদিকে এই ডামাডোলের মধ্যে কাজটা হাঁসিল করতে পারলে সব দিকেই সুরাহা হবে।

আর শিবু মাষ্টারের নামও বাড়বে দলের সামনে। নিজের লোক বলেও সে দলের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় নি।

প্রকাশ পেলে এইটাই রটবে।

সুতরাং শুভ কাজ এ নেমে পড়েছে তারা।

লোকজন জুটেছে ভেড়ির ওদিকে। আলাঘরের চারিদিক লাঠি সড়কি নিয়ে লোক এসে হাজির হয়েছে।

ভেড়ির লোকজনকে মারধোর করে বোমা পটকা ছুঁড়ে ওদিকে জলে জাল নামিয়েছে।

চীৎকার করছে—লুট করে নে সব মাছ।

কেশব ঘুঘু দূরে দাঁড়িয়ে হুকুম দেয়।

—নাম জলায়। যে আসবে সড়কি দে গেঁথে ফেলবি। ওরা মাছ তুলেছে। ভেড়ির পালকপতি—নরেশদের মারধোর করে মাথা ফাটিয়েছে।

হঠাৎ বিষ্টুবাবুকে আসতে দেখে গর্জন করে ওঠে জনতা—

এ ভেড়ির দখল আমাদের। চালাও—

গেঁথে ফেলবি যে ব্যাটা আসবে তাকে।

কলরব উঠছে। জাল ছিটকে ওঠে রূপালী মাছগুলো। এত দিনের জমানো হাজার হাজার টাকার মাছ চোখের সামনে ওরা লুট করে নেবে বিষ্টু চীৎকার করে,

—খবরদার!

কে একটা গুলিও চালিয়েছে।

গুলির শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। গোলক সরকার রক্তাক্ত অবস্থাতে ছুটে আসে—সরে আসুন বড়বাবু!

কেশব ঘুঘু এবার হাতে যেন রাজ্য পেয়েছে।

এগিয়ে আসে সে।

হঠাৎ জিপটাকে আসতে দেখে এবার সচকিত হয়ে ওঠে কেশব ঘুঘু।

বিষ্টুকে এরা ঘিরে ফেলেছে এবার এসেছে তাদের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী ভোলানাথ। কেশব নিজেই সড়কি বাগিয়ে লোকজন নিয়ে ছুটে আসে—

কিন্তু তার আগেই ভোলানাথ জিপের গতিবেগ বাড়িয়ে ওঠে ভেড়ির উপর তীর বেগে ছুটে আসে, তার জিপের প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ওই আক্রমণকারীর দল।

কারোও হাত পা ভেঙেছে কাউকে চাপা দিয়ে খতম করেছে, ভীত ত্রস্ত ওই লোকগুলো এবার রক্ত দেখে চীৎকার করে পালাচ্ছে।

কেশব ঘুঘু চীৎকার করে—খতম করে দে।

হাতের সড়কিটা ছুড়েছে সে, তার আগেই পতিত আর ভোলা লাফ দিয়ে পড়ে কেশবকে ধরেছে, আর ওকে নিয়ে পড়েছে ভেড়ির জলে।

তারপরই শুরু করেছে কেশবকে ধরে চোবানি দিতে।

কেশব ভাবেনি এমনি করে ভোলা তাকেই ধরবে এই কাণ্ড করে, এক বার ডুবুচ্ছে তুলছে আবার ডোবাতে থাকে তাকে।

শুনাচ্ছে ভোলানাথ—খতম করবি? ভেড়ি লুট করবি? আয় দেখছি তোকে—কেশব চীৎকার করছে—বাঁচাও—বাঁচাও।

ওই কাতর আর্তনাদ ম্যাজিকের মত কাজ করেছে।

তার মধ্যে পতিত বন্দুক তুলে শূন্যে পরপর কয়েকটা গুলি করতে এবার লুটেরার দল জাল ফেলে তীরে উঠে দৌড়াচ্ছে, পালাচ্ছে রণে ভঙ্গ দিয়ে।

আর তাদের পিছনে এবার ধাওয়া করে ভেড়ির লোকজন, বৃন্দাবন সরকার ও পিছনে নোতুন দলবল নিয়ে আসছে রণক্ষেত্রে।

এবার বিপদে পড়েছে এরা।

…ঘিরে ফেলেছে ওই লুটেরার দলকে, আর তার মধ্যে স্বয়ং শিবু মাষ্টারকে দেখে বিষ্টু অবাক হয়।—আপনি! আপনি এখানে এর মধ্যে?

শিবু মাষ্টার ভাবতে পারে নি যে হঠাৎ এমনি করে সব ব্যাপারটাই ওলট পালট হয়ে যাবে। প্রথমে সে আড়ালেই ছিল।

কেশব ঘুঘু দলবল নিয়ে মাছ লুট করতে নেমেছে, কাজ প্রায় হাঁসিল করে এনেছে, শিবু মাষ্টার এবার তার নায্য ভাগ যাতে কেশব মারতে না পারে তার জন্যই ব্যাকুল হয়ে ওপাশের গ্রামের বাঁশবন থেকে বের হয়ে আসছিল। তারপরই এই কাণ্ড বেধে যায়।

শিবু মাষ্টারকে দেখেছে অনেকেই। বৃন্দাবনের কথায় শিবু মাষ্টার একেবারে হাবভাব বদলে ফেলে—বলে,

—বিষ্টু, ভোলানাথের ভেড়ি লুট হবে চুপ করে দেখবো, তাই ছুটে এসেছি। কেশব ঘুঘুর এত বড় সাহস।

ততক্ষণ সারা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে।

কেবশচন্দ্র বেধড়ক পিটুনি আর কাদাজল চোবানি খেয়ে কঁকাচ্ছে।

তার দুচারজন সাকরেদও ধরা পড়েছে। তাদের অবস্থাও কাহিল আর শিবু মাষ্টার এবার প্রকাশ্যে গর্জাচ্ছে।

—দেখলে বাবা বিষ্টু বলিনি—এসব ওই কেশব ঘুঘু আর কেষ্টার কাজ। কেষ্টও খবরটা পেয়ে এসেছে।

ভোলাও কম বেশী আহত। বিষ্টুকেও প্রথমে কেশবের লোকেরা মারধোরও করেছে। কামিনী এবার কেষ্টকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—একি খুন খারাপি করতে গেছিল কেষ্ট। ভাই হয়ে ভাইদের এভাবে শেষ করতে চাস বিষয়ের জন্য? নে তোর বিষয়। ওরা এসবে থাকবে না। মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

লক্ষ্মী ঠিক ব্যাপারটা, তার কার্য কারণটাও এখন বুঝে উঠতে পারে নি। কেষ্টই এসবের মূল কিনা জানে না। তবে বেশ বুঝেছে লক্ষ্মী আজ ভোলা না গিয়ে পড়লে তার স্বামীর কি হতো বলা যায় না, তার বিষয় ভেড়ি সবই যেতো মায় প্রাণটাও।

বেপরোয়া ওই ভোলানাথ আজ সব বাঁচিয়েছে ওই লুটেরদের হাত থেকে।

কিন্তু কে প্রকৃত অপরাধী এটা জানা দরকার।

—কেষ্ট মায়ের ওই অভিযোগে আর ভাইদের অবস্থা দেখে আজ চমকে উঠেছে। আরত চমকে উঠেছে কেশব ঘুঘুকে দেখে।

—তুমি।

কেষ্ট গর্জে ওঠে—তুমি এসব করতে গেছলে শয়তান। আর বলছো আমার ভেড়ি আমিই পাঠিয়েছি তোমাকে লুট করতে?

কেষ্ট সপাটে কেশবকে একটা চড় ঝাড়তে কেশব ফেটে পড়ে—না মেজবাবুও, লোভ আমারই, দোষ আমরাই তবে একা আমি দোষী নই।—আর কে? বল? ভোলা গর্জে ওঠে।

কেশব চিনেছে ভোলাকে।

তাই পুনরায় প্রহৃত হবার ভয়ে বলে,—এই শিবু মাষ্টার। এখানে কোনরকম পাত্তা না পেয়ে শেষমেষ আমাকে নামালো, আধাআধি বকরায়। শিবু মাষ্টার গর্জে ওঠে—খবরদার কেশব। যাতা বলবি না।

বিষ্টু দেখছে শিবু মাষ্টারকে।

ভোলাও অবাক হয়। অবাক হয়েছে বৃন্দাবন সরকার।

কামিনী চমকে ওঠে—শেষ কালে আপনিও—

শিবু সাফাই গাইবার চেষ্টা করে, না-না! বিশ্বাস করুন।

কেষ্ট বলে—এসব থাক দাদা। ওদের পুলিশে দাও, তারা যা করার করবে।

লক্ষ্মী আজ যেন নোতুন করে সব ফিরে পেয়েছে।

কেষ্ট বলে—আমাকে ভুল বুঝো না মা। না এসে পড়লে এত বড় মিথ্যা কলঙ্কটা আমার উপরই জমতো।

লক্ষ্মী বলে—তাতো জমতোই। তা মেজ কোথায়।

...আর একজন খবর পেয়ে, ছুটে এসেছে।

সে মাধবী। বারাকপুরের কোন স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়ে বাস থেকে

নেমেই গ্রামে থমথমে আবহাওয়া দেখে সে অবাক হয়। দোকানে গঞ্জে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।

—ভোলাবাবু বিষ্টুবাবুদের সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। তারাও বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

দলে দলে লোক ছুটেছে।

তাদের সঙ্গে ছুটেছে মাধবীও। ভোলানাথ তাদের জন্য এদের অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছে।

আর মাধবী ভাবতে পারে না ভোলা নেই। একটি ব্যাকুল মন আজ কি আর্তি নিয়ে ছুটে চলেছে।

লক্ষ্মীর চোখ এড়ায় না এটা।

মাধবীর চোখমুখে উত্তেজনা—বৌদি।

মাধবী চোখের সামনে ব্যাপারটা দেখে নিশ্চিন্ত হয় এবার। বৈকালের পড়ন্ত আলোয় এত বড় অন্যায়।

লোভ এবং শয়তানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আজ ভোলানাথ, কাপড় চোপড়ের কাদার ছাপ, কপালে তখনও রক্তের দাগ—ও যেন তার বিজয় তিলক।

ভোলানাথও এগিয়ে আসে।

মাধবী দেখছে ওকে—চোট লেগেছে?

ভোলানাথ বলে—ও কিছু নয়। তুমি আবার কেন ছুটে এলে?

মাধবী জবাব দিল না। নীরবে চেয়ে থাকে ভোলানাথের দিকে। কামিনী বলে।

—অ বৌমা। বাছাদের চান খাওয়াও হয়নি। দিনভোর কি এই যুদ্ধই চলবে?

লক্ষ্মীর খেয়াল হয়।

সত্যিই মানুষগুলো আজ ক্লান্ত, শ্রান্ত। ওদের বিশ্রামের দরকার। আজ মনটা তার কি যেন সব পাবার ভোলানাথ জীবনে ভুল করে নি।

সমাপ্ত